নিব্বানং পরমং সুখং

NIBBANA THE SUPREME BLISS

সংকলন ঃ বিমান বিহারী চাকমা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalmoy Bhante

নিব্বানং পরমং সুখং

NIBBANA THE SUPREME BLISS

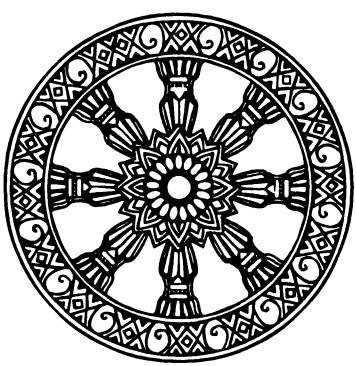

সংকলন
বিমান বিহারী চাকমা

প্রথম প্রকাশঃ

শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা,২৫৫৩ বুদ্ধাব্দ
১৪১৬ বঙ্গাব্দ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশকঃ

মদীয় আত্মীয়পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ

মুদ্রণেঃ রাজবন অফ্‌সেট প্রেস,
রাংগামাটি।

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ

বিমান বিহারী চাক্‌মা

শুভেচ্ছা মূল্যঃ- । ৮০

উৎসর্গ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহান সাধকপ্রবর সর্বজন
পূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়
এর নিরোগী ও দীর্ঘায়ু জীবন তথা আমার
সকল আত্মীয়-পরিজন, শুভানুধ্যায়ী
সকলের নির্বাণ ও আমার যাবতীয়
প্রার্থনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ
কামনায় দেব-মনুষ্যের হিতার্থে
বুদ্ধ শাসনে মৈত্রী
প্রফুল্লচিত্তে উৎসর্গ
করলাম।

বিমান বিহারী চাকমা

নিবেদন

বৌদ্ধ সাহিত্যে সিদ্ধার্থের জন্ম তথা ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে অজস্র পুস্তক রচিত হয়েছে। তবুও ইহার চিরন্তনী আবেদন যেন ফুরায় না। এ সংকলনটির প্রথম দিকে ভগিনী নিবেদিতার ইংরেজী লেখা হ'তে ভাব মাধুর্য বজায় রাখতে সাধু ভাষায় অনূদিত 'সিদ্ধার্থের জন্ম' অংশটি ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্ধারিত হলেও আশা করি সকলের কাছে তা সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হবে।

ভগবান বুদ্ধকে অকল্পনীয় পুরুষ বলা হয়েছে লৌকিক জ্ঞানে যাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবুও শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেব তাঁর 'বুদ্ধঃ এক আলোক বর্তিকা' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধে ভগবান বুদ্ধের এক মূল্যাংকনে প্রয়াসী হয়েছেন। আশা করি তাও পরিপক্ক পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি কাড়বে।

অসুস্থতাজনিত কারণে ও ব্যস্ততার দরুন সংকলনটির প্রতি খুব বেশি দৃষ্টি দিতে পারিনি, তাই ইহার অনিচ্ছাকৃত সম্ভাব্য যেকোন ভূলের জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

সংকলনটিতে সন্নিবেশিত প্রবন্ধসমূহ যথেষ্ট জ্ঞানপূর্ণ ও তথ্যবহুল। এ সংকলনটি পাঠে কেউ সামান্যতম উপকৃত হলেও আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে হবে।

পরিশেষে সংকলনটির প্রকাশনায় অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বিভিন্নভাবে যারা আমায় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সব্বে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু

বিনীত

বিমান বিহারী চাকমা

শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা,
২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

ভূমিকা

'হে আনন্দ ভক্তেরা যে আমার পূজা করে ফুল দিয়ে দীপধূনা দিয়ে আরও নানাভাবে তাতে তথাগতের প্রকৃত পূজা হয় না,যারা আমার উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে,আদর্শ অনুসরণ করে ধর্মপ্রাণ হয়,তারাই তথাগতকে মানে পূজা করে পরম পূজায়। হে আনন্দ তাই তোমরা ধর্মনিষ্ঠ হবার জন্য কৃতসংকল্প হও।' বুদ্ধের অন্তিম বাণীসমূহের মধ্যে অন্যতম উপরোক্ত বাণীর মধ্যে তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলতত্ত্ব (rudiment) নিহিত রয়েছে। তাঁর ধর্ম যে আচারসর্বস্ব কিংবা লোক দেখানো ধর্ম নয় বাণীটিতে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ ধর্ম চারিত্রিক বিশুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ সাধনের ধর্ম কারণ সঠিক কর্মোদ্যম ও এ দু'টি ছাড়া এ ধর্মের অভীষ্ট লক্ষ্য পুরণ হবার নয়। সাধারণ দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের মৌলিক পার্থক্য হ'ল সাধারণ দর্শন অনুশীলন বিহীন জ্ঞানালোচনা মাত্র। অপর দিকে বৌদ্ধদর্শন জ্ঞানালোচনা তথা অনুশীলনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে। এ ধর্মের মূল লক্ষ্য স্বর্গ কিংবা দেবলোক নয়, নয় কোন দেবাতিদেবের অফুরান শুভেচ্ছা। সর্ব দুঃখ মুক্তি যেখানে এ ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য তা অর্জনে নিষ্প্রাণ কর্মকান্ডে জীবন কাটিয়ে দিয়ে শুধু জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এ ধর্ম মতে কেবল মূর্খদেরই কাজ কারণ জগত দুঃখময়। লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় অন্যান্য ধর্মে যারা পাপী এ ধর্মে তারা অসৎ-মূর্খ কারণ মূর্খতার দরুনই মানুষ দুষ্কর্ম করে থাকে। বলা বাহুল্য মূর্খের সান্নিধ্য দুঃখজনক ও পরিত্যাজ্য কারণ অজ্ঞতাই সকল দুঃখের মূল। অন্যদিকে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- জ্ঞানীর সেবা করা, গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা ও পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা অন্যতম

উত্তম মঙ্গল। গৃহীদের জন্য নির্ধারিত 'পঞ্চশীল' কে উত্তম জীবন-যাপনের মানদন্ড বলা হয়েছে। পঞ্চশীল পালনকারীর জীবন সুখকর হয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কখনো নরকে পতিত হয় না। 'বুদ্ধ' শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানী (সর্বজ্ঞ, সদাজাগ্রত পুরুষ, আলোক প্রাপ্ত পুরুষ, মুক্ত পুরুষ)। তাই বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির জ্ঞান লাভের হেতু উৎপন্ন হয়। 'ধর্ম' শব্দের এক অর্থ নীতি। নীতিবান ব্যক্তি সুখী হয়ে থাকে। তাই কথায় বলে-ধার্মীকেরা সুখী (The Pious are happy)। এ বাক্যটি ধর্মীয় পুস্তকের বাইরে কোন

কোন ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণ বইয়েও পরিদৃষ্ট হয়। 'সংঘ' শব্দের অপর নাম একতা। ভিক্ষু সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

মানব সভ্যতার ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অতীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ছিল। যেমন কর্ম তেমন ফল (As you sow so shall you reap) কথাটি নিঃসন্দেহে কর্মবাদী বৌদ্ধধর্ম হতে গৃহীত হয়েছে। এ প্রভাব শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই এ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে গর্ব করে থাকে। মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসেবে ভারতীয় পতাকায় অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম চক্রটি সমুজ্জ্বল হয়ে স্বগৌরবে শোভা পাচ্ছে যা চিরঅম্লান থাকবে।

এ ধর্মের দর্শন যেমন যুবরাজ সিদ্ধার্থকে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ করেছিল তেমনি সৃষ্টি করেছিল আদর্শ নৃপতি, আদর্শ শাসনতন্ত্র, আদর্শ সভ্যতাও। এভাবে এ দর্শন দ্বারা মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। বর্তমানেও এ অভিধর্মের বিদর্শন চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিশেষ অংশ (Mental Therapy) হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এ ধর্মের বিদর্শনের এক বহুমুখী উপযোগিতা রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন,"সর্ব দুঃখ মুক্তির জন্য বিদর্শনই একমাত্র পথ"। নানাবিধ অলৌকিক শক্তি লাভে, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্যে যুগযুগ ধরে এই বিদর্শন ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভগবান বুদ্ধের মতে সেসকল অলৌকিক শক্তি তুচ্ছ লৌকিক ধর্ম এবং নির্বাণ লাভে সেসব অপরিহার্য নয়। সর্ব দুঃখ মুক্তির উপায় খুঁজতে দীর্ঘ ছ'বছর ধরে ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ গভীর সাধনা ও তপস্যার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর উপলব্ধ ধর্ম সাধারণের কাছে সহজবোধ্য হবে না ভেবে প্রথমে তা প্রচারে তিনি বিমুখ ছিলেন। পরে জগতের দুঃখক্লিষ্ট জীবগণের প্রতি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে পারলেন যে তাঁর নব ধর্ম অনুধাবনে সক্ষম কিছু পন্ডিত-জ্ঞানী ব্যক্তি সংসারে বিদ্যমান। তখন সকল দ্বিধা-সংশয় কাটিয়ে নির্জন বনভূমি কাঁপিয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন- **'সকলের জন্য অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হোক, যার কান আছে সে শুনুক বিশ্বাস করুক।'** অতঃপর শুরু হ'ল তাঁর সাধনালব্দ নব ধর্মের প্রচারাভিযান। এ দর্শন মতে এ দেহে বর্তমানে সক্রিয় চিত্তপ্রবাহ অতীতে যেমন ছিল,তৃষ্ণাক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে

দুঃখময় বিভিন্ন জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে।বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য পূর্ববর্তী বিভিন্ন জন্মসমূহে দশ পারমী পূরণের মাধ্যমে তথা এই জীবনে ছ'বছর যাবত সেই উর্বর মস্তিষ্কের কঠোর সাধনা ও তপস্যার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এ দর্শন মতে এক জন্মের অন্তিম বিজ্ঞানের (চেতনার)লয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপর জন্মের প্রথম বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং এই প্রকারে প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে। এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত মন (জীব)যে মধ্য অবস্থায় অবস্থিত থাকে তাকে অন্তরাভব, গন্ধর্ব ও মনোময় বলা হয়।এ প্রবাহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরও প্রকৃতিগতভাবে তা ক্রিয়াশীল থাকে এবং অন্তরাভবের এ মনোময় প্রক্রিয়া যেরূপ শরীরে উৎপন্ন হতে হয় তার আকৃতিও তদ্রূপ হয়ে থাকে এবং তা ঘটে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে। কর্মানুযায়ী জন্মস্থান নির্ধারিত হলে জীবের জন্মান্তর ঘটে এবং স্বীয় গতিপথে অন্তরাভবের এ মনোময় প্রক্রিয়ার সপ্তাহকাল পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। মৃত্যু জীবগণের জন্মজন্মান্তরের অনন্ত যাত্রায় সাময়িক পরিণতি বা চ্যুতি। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন "দুঃখা জাতি পুনঃপ্পুঃনং" অর্থাৎ বার বার জন্ম গ্রহণ করা দুঃখ। নির্বাণই জীবগণের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় যেখানে জন্মমৃত্যুর নেই কোন বিভীষিকাময় যন্ত্রনাদায়ক হাহাকার। নির্বাণ শান্ত, ধ্রুব,ও চিরশাশ্বতঃ। কোন কিছুর সাথে তা তুলনীয় নয় যা অনির্বচনীয়। বুদ্ধ নির্বাণের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক কথায় শুধু বলেছেন নির্বাণ পরম সুখ, চরম শান্তি। এ দর্শনমতে- প্রত্যেক চিত্তক্ষণ এক একটি জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। প্রতিটি পূর্ববর্তী মুহূর্ত পরবর্তী অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে। প্রটি মূহূর্তে পরিবর্তনশীল সর্বশেষ চিত্তই পরবর্তী জন্মের নিয়ামক অর্থাৎ বর্তমান কর্মের ধরণের ওপরই পরবর্তী জন্মের অবস্থা, কুল প্রভৃতি নির্ভরশীল(যেমন কর্ম তেমন ফল)। তাই এ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ধরে রাখার জন্য এখনই সচেতন সকলের সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য জন্ম এক বার হারিয়ে ফেললে তা পুনরায় লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। সীমাহীন দুঃখে পতন হ'তে ধারণ করে(ধরে) রাখে বলে ভগবান বুদ্ধের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলা হয়।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় বিশেষতঃ উত্তর ভারতের প্রাচীন জনপদসমূহে তাঁর ধর্ম প্রচারাভিযান চালিয়ে যান সুদীর্ঘ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর ধরে। এ সময় বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করে। তৎকালীন নরপতিদের মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিত, কৌশাম্বীর

রাজা উদয়ন প্রমূখ রাজন্যবর্গের আনুকূল্য তিনি লাভ করেন যাঁরা তাঁর আগমনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠতেন। পরবর্তীকালে যে সকল নৃপতি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁদের মধ্যে কুষাণসম্রাট কণিষ্ক, গ্রীকবীর মেণাণ্ডার ও মৌর্য সম্রাট অশোকের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে অন্যতম সম্রাট হিসেবে তিনি ইতিহাসে স্থান লাভ করেন।ধর্ম প্রচারাভিযানের একপর্যায়ে ভগবান বুদ্ধ একসময় কেশপুত্রীয় কালাম ব্রাহ্মণগণের গ্রামে এসে উপনীত হন। তখন প্রকৃত ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি ব্রাহ্মণদের বলেন-'হে কালামগণ, বহুলোক বিশ্বাস করে বলে কোন মতবাদ গ্রহন করবেন না। আপনাদের আচার্যগণের কথিত বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ করবেন না।আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে উল্লেখ রয়েছে বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ করবেন না। প্রত্যেক বাণী নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করবেন। বার বার যাচাইয়ের পর যখন আপনারা জানবেন যে এ ধর্মগুলো কুশল অনবদ্য, বিজ্ঞ প্রশংসিত এগুলোর অনুসরণে মঙ্গল সাধিত হয়, সুখ উৎপন্ন হয় কেবল তখনি এগুলো পালন করবেন, অন্যথায় বর্জন করবেন।' (– কালাম সূত্র)

উপরোক্ত বাণী থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি যে অর্থহীন যেকোন সংস্কার পরিত্যজ্য এবং সদর্থপূর্ণ উপকারী যেকোন সংস্কার পালনীয়। বাবু বিমান বিহারী চাকমার এ শুভ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংনীয় উদ্যোগ। কামনা করি তিনি ইহ পরকালে সর্বাঙ্গীন সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে অনির্বাণকাল যাবত জন্ম জন্মান্তরে সর্বসম্পত্তি লাভ করতঃ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুখী হয়ে তাঁর যাবতীয় প্রার্থনা পূরণ হউক ও পরিণামে ইচ্ছানুরূপ পরম সুখ নির্বাণলাভে তিনি কৃতার্থ হউন।

॥ভবতু সব্বমঙ্গলং ॥

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির
বিহারাধ্যক্ষ
ধর্মপুর আর্য বন বিহার,
খাগড়াছড়ি।

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা
০১। ভূমিকা– শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির	০৫
০২। সিদ্ধার্থের জন্ম– ভগিনী নিবেদিতা	১১
০৩। বুদ্ধঃ এক আলোক বর্তিকা– আবুল ফজল	২৯
০৪। বৌদ্ধদর্শনে অনাত্মবাদ– ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী	৩৫
০৫। সংতুট্‌ঠী পরমং ধনম্– উপাসিকা আর. তুলী	৪১
০৬। নিব্বানং পরমং সুখং– ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী	৪৬
০৭। বুদ্ধের দর্শনে রাজা প্রসেনজিত– শীলানন্দ ব্রহ্মচারী	৫৩
০৮। এহিপস্‌সিকো– এসো দেখো সংগৃহীত	৫৮
০৯। সুভাষিত সংগ্রহ	৫৮
১০। বির্দশন ভাবনাকে কোন্ কোন্ পথের সাথে তুলনা করা যায়	৬১
১১। সহায়ক গ্রন্থাবলী	৬২

সিদ্ধার্থের জন্ম

উত্তর ভারতের একপ্রান্তে কপিলাবস্তু নামক নগর ছিল। দেশের রাজা সেখানে বাস করিতেন। ২৫০০ বৎসরেরও আগে একদা নগর ও রাজপ্রাসাদ আনন্দ-কোলাহলে-মুখরিত হইয়া উঠিল কারণ রাজকুমার গৌতম সেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দের নিকটবর্তী এক সময়ে রাণী মহামায়া হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাঁহার পিত্রালয়ে দেবদহ রাজ্যে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কৈলাশ নগরের দেবদহ ও শাক্যরাজ্যের মধ্যবর্তী বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলের তখনকার সেই রুমেনদেহি পরবর্তীকালে রুমেনী ও বর্তমানে লুম্বিনী নামক স্থানে বিভিন্ন ফুলের গাছ ও নানান গাছে ভরপুর এক অত্যন্ত মনোরম শালবনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভূমিস্থ হন।

'রুমেনদেহি' অর্থ করমুক্ত। সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহনের ২০(বিশ) বছর পর ভিক্ষু উপগুপ্তের পরামর্শে বুদ্ধের সঠিক জন্মস্থান চিহ্নিত করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মানসে খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে লুম্বিনীতে তীর্থ ভ্রমণে আসেন এবং স্থানটিকে করমুক্ত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করেন। তাই ইহার তেমন নামকরণ হয়। সম্রাট অশোক বুদ্ধের সঠিক জন্মস্থান বলিয়া চিহ্নিত স্থানটিতে একটি পিলার নির্মান করেন যাহা অশোকান পিলার (Asokan Pillar) নামে পরিচিতি লাভ করে।

সে যা'ই হউক যাহারা রাজার নিকট কুমারের জন্ম সুসংবাদ প্রথমে আনিল তাহাদিগকে রাজা প্রথানুযায়ী যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। রাজভৃত্য ও পরিচারকবৃন্দ সকলেই পুরস্কারের ভাগ পাইল। দান-দক্ষিণার পালা শেষ করিয়া রাজা একটি নিভৃত কক্ষে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে কয়েকজন পণ্ডিত খড়ি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। উহারা গভীর মনোযোগের সহিত অঙ্ক কষিতেছিলেন এবং অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটিতেছিলেন।

তোমরা হয়তো অবাক্ হইয়া ভাবিতেছ, এ আবার কি? পন্ডিতেরা কি করিতেছিলেন? রাজকুমারের জন্মকালে আকাশে কোন্ গ্রহ কোথায় ছিল পন্ডিতেরা তাহাই গুণিতেছিলেন। আর গ্রহগুলির অবস্থান হইতে তাঁহারা জাতকের ভবিষ্যৎ-জীবনও গুণিয়া বাহির করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে ইহা একটি খুব প্রাচীন প্রথা। গ্রহসংস্থান বিচার করিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে যে কাগজ গণকঠাকুর লিখিয়া দেন তাহার নাম ঠিকুজি। এমন হিন্দু পরিবারের কথাও আমি জানি যেখানে ১৩০০ বছর আগেকার পূর্ব পুরুষদের নাম এবং ঠিকুজি যত্নে রক্ষিত আছে।

রাজকুমারের ঠিকুজি তৈয়ার করিতে পন্ডিতেরা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগাইলেন। জাতকের ভবিষ্যৎ এরূপ অদ্ভুত ও অসাধারণ বলিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বারংবার গণনার নির্ভূলতা পরীক্ষা না করিয়া এবং নিজেদের মধ্যে একমত না হইয়া তাঁহারা রাজার নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। অবশেষে যখন নিঃসন্দেহ ও একমত হইলেন তখন তাঁহারা রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জাতকের ফাঁড়া-টাড়া নাই তো?' জ্যোতিষীদের মধ্যে যিনি বর্ষীয়ান্ ছিলেন তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ, জাতক দীর্ঘজীবী হবে।'

রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,'সুসংবাদ বটে!' শিশু বাঁচিবে কিনা এই বিষয়েই রাজার মনে বিশেষ শঙ্কা ছিল।

ইহার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য বিষয় ধীরে সুস্থে শুনিলেও আপত্তি ছিল না। বৃদ্ধ পন্ডিত আর প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া নিজের কথা শেষ করিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন, 'জাতক দীর্ঘজীবী হবে, কিন্তু যদি আমাদের গণনা নির্ভূল হয়ে থাকে তবে অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে কুমারের জননী সম্রাজ্ঞী মায়াদেবী পরলোক গমণ করবেন। হে রাজন্, যদি এরূপ ঘটে তবে আপনি জানবেন যে, এই কুমার হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হবেন, নতুবা মানবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে সংসার ত্যাগপূর্বক নূতন ধর্ম প্রচার করবেন।' এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ পন্ডিত রাজার হাতে গণনার কাগজ পত্র তুলিয়া দিলেন এবং সঙ্গীদের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

একলা ঘরে বসিয়া রাজা চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কানে এই কথাগুলি বাজিতে লাগিল, **'রাণী পরলোক গমন করবেন,– সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, – ধর্মসংস্থাপক।'** সপ্তাহকাল পরে যে ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিবে, তাহা অতি নিদারুণ সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্যোতিষীর শেষ কথাগুলি রাজার মনে যে চিত্র জাগাইয়া তুলিল তাহা ছিল আরও নিদারুণ। 'ধর্মপ্রচারক, 'সে তো সন্ন্যাসী,–ফকির! ভাবিতেই রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। আচ্ছা দাঁড়াও! পণ্ডিত বলিয়াছেন, **'মানবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে**

সংসার ত্যাগ করবেন।' গৌতম যদি কখনো মানবের দুঃখ না দেখেন তবে হয়তো ভবিতব্যের খণ্ডন হইতে পারে। রাজা মনে মনে সঙ্কল্প করলেন কুমারকে কখনও মানুষের দুঃখ দুর্দশার সহিত পরিচিত হইতে দিবেন না। তাহা হইলে সন্ন্যাসী না হইয়া কুমার দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হইবেন– রাজারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

পণ্ডিতগণের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করিয়া মায়াদেবীর আত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সপ্তাহকাল ধরিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা, যত্ন ও চিকিৎসার জন্য মানুষের পক্ষে যাহা সাধ্য তাহা সমস্তই করা হইল; কিন্তু কোন ফল হইল না। সপ্তম দিবসে বোধ হইল যেন তিনি শিশুর ন্যায় নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছেন। সেই নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

একে রাণীর বিরহে রাজা কাতর, তাহার উপর এই দুশ্চিন্তা তাঁহার মনে চাপিয়া বসিল যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমটুকু যখন ফলিয়াছে তখন বাকীটুকুও ফলিবে। তাঁহার এখন শুধু এই এক ভাবনা– কিসে গৌতম সন্ন্যাসী না হইয়া রাজরাজেশ্বর হইতে পারেন। যখন দুই সম্ভাবনাই আছে তখন চেষ্টা করিয়া সন্ন্যাসের সম্ভাবনাকে দুর করিতেই হইবে।

ইহার কিছুকাল পর একদা রাজা শুদ্ধোদন শাক্যগণসহ বসিয়া আছেন, সহসা তাঁহার অন্তরে মায়াদেবীর স্বপ্ন বিবরণ উদিত হইল।তখন তিনি শাক্যগণের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত হইলেন।এই কুমার কি চক্রবর্তী রাজা হইবেন, না, প্রব্রর্জনার্থ সন্যাসী হইয়া সংসার হইতে বহির্গত হইবেন? এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় হিমালয় পর্বতের পার্শ্বস্থ অসিত (কালদেবল) নামে একপরম জ্ঞানী মহর্ষি নরদত্ত (নালক) নামক ভাগেনিয়সহ কপিলাবস্তু নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি কুমারের জন্ম উপলক্ষে স্বর্গে দেবলোকে অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগ চক্ষুতে ও দিব্যজ্ঞানে নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমারের শুভদর্শনাভিপ্রায়ে রাজদ্বারে আসিয়াছিলেন। মহর্ষি দৌবারিক (দ্বাররক্ষক) দ্বারা রাজসমীপে সংবাদ দিলেন যে দ্বারে অসিত ঋষি দণ্ডায়মান। দৌবারিক তাহা শুনিয়া তৎক্ষনাৎ রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, এক জীর্ণ বৃদ্ধ ঋষি দ্বারে উপস্থিত। নৃপতি তাহা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন 'মহার্ষিকে প্রবেশ করিতে বল। ঋষি অসিত রাজার অনুমতি পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে রাজার মুখোমুখী হইতেই রাজা ঋষির পদযুগল স্পর্শ করিয়া ঋষিকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'ভগবন, আপনার দর্শনজন্য আমি ত স্মরণ করি নাই বা আশা

করি নাই, তবে কি নিমিত্ত অভ্যাগত হইয়াছেন?' তিনি বলিলেন **'মহারাজ আপনার পুত্র হইয়াছে, তাই দেখিতে আসিয়াছি।'** রাজা কহিলেন, **'কুমার এখন নিদ্রিত,'** ঋষি বলিলেন, **'মহারাজ, মহাপুরুষেরা চিরনিদ্রিত থাকেন না, তাঁহারা সদা জাগরণশীল।'** মহারাজ ঋষির কথায় পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষনাৎ দুই বাহু প্রসারণপূর্বক কুমারকে অঙ্কে লইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। অসিত ঋষি শিশুকে বত্রিশটি মহাপুরুষ– লক্ষণ সমন্বিত দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মৃদু হাসিলেন, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিলেন এবং লক্ষণ দ্বারা কুমার গৃহে থাকিলে রাজচক্রবর্তী, প্রব্রর্জন করিলে তথাগত হইবেন, বুঝিতে পারিলেন। পরক্ষণে তিনি ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্তম্ভিত বদনে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা বিষন্ন ও ভীত হইলেন। বিচলিত রাজা বলিলেন, 'তপোধন, আপনি কেন রোদন করিতেছেন? কুমারের তো কোন অমঙ্গল ঘটিবে না?' ঋষি বলিলেন, 'আমি কুমারের জন্য রোদন করিতেছি না, তাঁহার কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই; আমি আমার জন্য রোদন করিতেছি। মহারাজ, আমি জীর্ণ বৃদ্ধ। এই কুমার ভবিষ্যতে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া দেবলোক এবং নরলোকে হিত ও সুখের জন্য আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ সুন্দর অর্থযুক্ত ধর্ম উপদেশ দিবেন। তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া অসংখ্য জীব দুঃখমুক্তি লাভ করিবে। তাহা অবগত হইয়া আমি পুলকিত ও আহলাদিত বোধ করিতেছি। কিন্তু তখন আমার জীবনাবসান হইবে ও তাঁহার ধর্মশ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমার মোক্ষলাভ বিলম্বিত হইবে জ্ঞাত হইয়া আমি রোদন করিতেছি। কুমার সর্বার্থসিদ্ধ ও ভবিষ্যতের সম্যক সম্বুদ্ধ।' ইহাতে রাজা আশ্বস্ত ও চিন্তামুক্ত হইলেন।

মহর্ষি অসিত তাঁহার ভাগিনেয় নরদত্তকে এই উপদেশ করিলেন, 'তুমি যখন শ্রবণ করিবে যে ইহলোকে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শাসনানুসারে প্রবর্জন করিবে। ইহা তোমার চিরদিনের জন্য অর্থ, হিত এবং সুখের কারণ হইবে।'

শশিকলার ন্যায় গৌতম বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার লালন পালন করিত, তাহাদের সকলের মনেই এই ধারণা জন্মিল যে, ইনি কালে অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন! শিশু গৌতমের মুখ সর্বদাই হাসি ভরা ও প্রতিভায় উজ্জ্বল ছিল। কি লেখাপড়া, কি খেলাধূলা সকল বিষয় তিনি

নিমেষে আয়ত্ত করিতেন। সর্বোপরি ছিল তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও অসীম কারুণ্য। তাঁহার দৃষ্টিতে যাদু ছিল; একবার তাঁহার চোখে চোখ পড়িলে আকৃষ্ট না হইয়া উপায় ছিল না; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; কেহ তাঁহার সহিত ঝগড়া বাধাইতে পারিত না। লোকে বলিত তাঁহার মধ্যে কেবলি প্রেম ও করুণা; রেষারেষি ও দ্বন্দ্বের স্থান নাই। একটি ডানা-ভাঙ্গা পাখীকে তিনি অশেষ যত্নে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন। কপিলাবস্তুর অন্যান্য রাজকুমার ও অভিজাত বালকদের ন্যায় তিনি কখনও মূক পশুপক্ষীর উপর তীর ছুঁড়িতেন না। তিনি বলিতেন–এরাও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, এরা আমাদের ছোট ভাই, ইহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ উপভোগ করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। তীরের ঘায়ে যে ব্যথা হয় সে কথা গৌতম বাল্যকালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু জগতের অন্য কোন দুঃখের সহিত তাঁহার তখনও পরিচয় হয় নাই। তাঁহার বাড়ী ছিল একটি প্রাসাদ। উহার চারিদিকে ছিল অনেক মাইল ব্যাপিয়া মনোহর উদ্যান। সে উদ্যানের সীমা ছাড়াইয়া বালক গৌতম কখনও বাহিরে যান নাই। বাগানের ভিতরে তিনি খুশী মত ঘোড়ায় চড়িতেন কিংবা তীর–ছোঁড়া অভ্যাস করিতেন; কখনও বা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং কত কি ভাবিতেন। বাগান–বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে কোনরূপ দুঃখ–দুর্দশার চিহ্ন ছিল না; অন্ততঃ গৌতমের পক্ষে ছিল না, কারণ দুঃখ কাহাকে বলে তাহা তিনি তখনও জানিতেন না। সেই উদ্যান–বাটিকা ছিল শিশুর পক্ষে একটি রাজ্যবিশেষ; উহার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা বালক গৌতমের মনে কখনও জাগে নাই। রাজার হুকুম ছিল গৌতমের কানের কাছে কেহ দুঃখ–দুর্দশা, রোগ–শোক– মৃত্যুর নামোল্লেখ করিতে পারিবে না। এসব ব্যাপার যে পৃথিবীতে আছে তাহা গৌতমএকেবারেই জানিতেন না। 'মানবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে' জ্যোতিষীর এই কথাগুলি রাজার কানে সর্বদাই বাজিত। তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ছিল যাহাতে মানবের দুঃখের সহিত গৌতমের কখনও পরিচয় না ঘটে।

প্রাচীন ভারতে ইহাই নিয়ম ছিল যে, ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত যুবকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবে। তারপর তাহারা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারে। অতএব ত্রিশ বছর বয়সে গৌতম যদি ইচ্ছা করিতেন যে তিনি বিদেশে যাইবেন তবে কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না। ত্রিশ বছর যাহার বয়স সে প্রাপ্তবয়স্ক;–রাজারও অধিকার ছিল না তাহাকে আটকাইয়া

রাখেন। এই বয়সে কুমারকে কিরূপে সামলানো যায় তাহার জন্যও ফন্দি আঁটা হইল। কুমারকে তো ব্যথা দেওয়া যায় না; অতএব যুক্তি স্থির হইল ফুলের বাঁধনে তাঁহাকে বাঁধিতে হইবে। গৌতমকে বলা হইল তাঁহার বিবাহ-যোগ্য বয়স হইয়াছে;- তাঁহার উচিত এখন বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করা। রাজা ভাবিলেন কোন রকমে আরও কিছুদিন গেলেই ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে। একবার পত্নী ও পুত্রকন্যার মায়াপাশে বাঁধা পড়িলে গৌতম সাংসারিক সুখভোগ ও উন্নতির দিকেই মন দিবেন, সংসার ত্যাগের বাসনা আর তাঁহার চিত্তে স্থান পাইবে না। গৌতম তখন ধনসঞ্চয় ও রাজ্য-বিস্তার করিতেই ইচ্ছুক হইবেন। জ্যোতিষীর গণনানুযায়ী গৌতম তাহা হইলে সন্ন্যাসী না সাজিয়া দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হইবেন।

বিবাহের প্রস্তাবে গৌতম রাজী হইলেন, কিন্তু একটা শর্ত করিলেন যে, পাত্রী তিনি নিজে মনোনীত করিবেন। অভিজাত- বংশীয় যুবকদের মধ্যে যাহাদের বিবাহযোগ্যা ভগিনী ছিল, তাহাদের ভগিনীগণসহ সকলকেই রাজপ্রাসাদে সপ্তাহ-কাল কাটাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। প্রাসাদে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে যুবকদের মল্লক্রীড়া, বিকালে অন্যান্য খেলা; ম্যাজিক ও সাপ-নাচানো প্রভৃতি। সকলে মিলিয়া সারাক্ষণ কেবলি আমোদ-প্রমোদের ধুম।

সমাগতা পাত্রীদের মধ্যে যশোধরা নাম্নী কুমারী ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের তুলনা ছিল না; বংশমর্যাদারও ত্রুটি ছিল না। রাজা, মন্ত্রীমন্ডল ও পারিষদবর্গ সকলেরই মনে মনে ইচ্ছা- কুমার যেন যশোধরাকেই বধূত্বে বরণ করেন।

সপ্তাহান্তে বিদায়ের পালা আসিল। রাজকুমার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অতিথিগণকে একে একে বিদায় দিতে লাগিলেন। কুমারীদিগকে ভাল ভাল উপহার দেওয়া হইল- কাহাকেও হার, কাহাকেও চুড়ি, কাহাকেও মণিরত্ন ইত্যাদি। যশোধরা যখন বিদায় লইলেন তখন গৌতম তাঁহাকে কোন বহুমূল্য উপহার দিলেন না- শুধু একটি ফুল নিজের গলার মালা হইতে খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। এই বাহ্য অবহেলাতে দর্শকেরা ভাবিলেন গৌতম অন্য কাহাকেও পছন্দ করিয়াছেন এবং মনে মনে তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কুমারী ভুল করিলেন না। তিনি ঠিক বুঝিলেন যে,এই ফুল হীরা মানিক অপেক্ষা অনেক বেশী দামী। পরদিন প্রাতে যখন রাজা শুদ্ধোদন যশোধরার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন

তখন যশোধরা মোটেই বিস্মিত হইলেন না। তিনি বরং ইহা ভাবিয়াই বিস্মিতা হইলেন যে, ব্যাপারটা এত সহজে নিষ্পন্ন হইয়া গেল! তিনি যে গৌতমের পূর্ব পূর্ব জন্মের সঙ্গিনী– এই ভাব হয়তো তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল।

কিন্তু যশোধরার পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। ক্ষত্রিয়ের আচার অনুযায়ী গৌতমের ইহা কর্তব্য ছিল যে,অন্যান্য প্রার্থীদের অপেক্ষা শৌর্যবীর্যে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। এইরূপ না করিলে সম্মানের হানি হয়। যশোধরার পিতা রাজার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন; কিন্তু বলিলেন যে, গৌতমকে নিজ বীরত্বের ও গুণের যথাবিহিত পরিচয় দিয়া তৎপরে যশোধরার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে।

উত্তর শুনিয়া গৌতম খুব আহ্লাদিত হইলেন এবং অন্যান্য প্রার্থীদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একেবারেও মল্লক্রীড়ার দিনও ঠিক করিয়া দিলেন। গৌতমের অত্মীয়স্বজনেরা ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, **'হায়! কি প্রমাদ ঘটল! তুমি তো বাপু জন্মে একটা উড়ন্ত পাখি কিংবা একটা দৌড়ন্ত হরিণও শিকার করনি; এখন ক্রীড়াভূমিতে কি ক'রে ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় বেগবান্ বুনো শুয়োরকে বধ করবে? আর বড় বড় ধনুর্ধরের সঙ্গে তীর-ধনুর খেলায়ই বা তুমি কি এঁটে উঠতে পারবে?'** এ– সকল প্রশ্নের উত্তরে গৌতম কেবল মৃদু হাসিলেন। ভয় কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তখন তাঁহার ভিতরে অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলিয়া গিয়াছে। যখন মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন সকলে বুঝিল যে, গৌতমের আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ সঙ্গত ছিল। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া গৌতম একে একে সবগুলি পুরস্কার হস্তগত করিলেন।

এইরূপে রাজকুমার গৌতমের সহিত যশোধরার পরিণয় সম্পন্ন হইল।

নবদম্পতির জন্য নূতন সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হইল। স্রোতস্বতীর ধারে গোলাপী পাথর দিয়া একটি বাড়ী তৈরী হইল। তাহার বড় খিলান এবং অপূর্ব কারুকার্যমন্ডিত নানাবিধ কাঠের সাজের তুলনা হয় না। উদ্যানের এক প্রান্তে খরস্রোতা তটিনী একটি শ্বেত মর্মরের দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই দ্বীপের উপরে গ্রীষ্মকালীন প্রমোদভবন নির্মিত হইল।

প্রমোদভবনকে স্নিগ্ধ সুশীতল করিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি রহিল না। বাড়ীটির চারিদিকে নদীগর্ভে অসংখ্য ফোয়ারা রচিত হইয়াছিল – যেগুলি ইচ্ছামত খুলিয়া দেওয়া যাইত। সমস্ত বাতায়নে পাথর অথবা

কাঠের জালি লাগানো হইল যাহাতে রৌদ্র ভিতরে প্রবেশ না করে, আব্রু রক্ষা হয় অথচ ভিতর হইতে বাহিরের সব কিছু অনায়াসে দেখা যায়। গ্রীষ্মবাসের চারিদিকে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত মনোরম উদ্যান– অসংখ্য প্রকার ফুল ও ফলের গাছে ভরতি। প্রাসাদের ভিতরে প্রতি হলঘরের পাশে দুজন বসিবার মতো দোলনা টাঙানো ছিল। গরমের দিনে দোলনায় বসিয়া দোল খাইলে সুস্নিগ্ধ বাতাস দেহকে শীতল করিত– অথবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে দাসদাসীরা চামর-বীজন করিত। রাজপুত্র ও রাজবধূর জন্য সুশ্রী ও হাসিমুখ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া দাসদাসী নিযুক্ত করা হইত। একজন মন্ত্রীর উপর এই বাছাইয়ের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

সমস্ত বন্দোবস্ত এমনভাবে করা হইয়াছিল যেন রাজকুমার কখনও কাহারও চোখের জল না দেখেন– তাঁহার কানে যেন কোন বেদনার ধ্বনি প্রবেশ না করে। কোন প্রকার রোগ, শোক কিংবা মৃত্যুর দৃশ্যও তাঁহার চোখে পড়া নিষিদ্ধ ছিল। গৌতম কখনও নগরে যাইতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ নানাপ্রকার আমোদ– প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে যেন ভুলাইবার চেষ্টা করা হয় – ইহাই ছিল রাজার স্পষ্ট আদেশ।

কিন্তু নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়। রাজা মোটেই ভাবেন নাই যে, যখন গৌতমের বৈরাগ্যের সময় আসিবে তখন এই সকল বিধি–নিষেধ তাঁহার মুক্তির বাসনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে। তিনি যেভাবে গৌতমকে রাখিয়াছিলেন, তাহাকে 'জীবন' বলা যায় না–উহা ছিল একটা খেলা কিংবা স্বপ্ন। খেলা এবং স্বপ্ন যতই মধুর হউক, উহা মিথ্যা– উহাতে মানুষের তৃপ্তি হইতে পারে না। মিথ্যার জাল ভেদ করিয়া সত্যকে পাইবার তীব্র বাসনা একদিন- না- একদিন গৌতমের মনে না জাগিয়া গত্যন্তর ছিল না।

অবশেষে তাহাই হইল। সহসা গৌতম একদিন সারথিকে রথ প্রস্তুত করিবার জন্য হুকুম দিলেন এবং বলিলেন তাঁহাকে প্রাচীরের বাহিরে কপিলাবস্তু নগর দেখাইয়া আনিতে হইবে। মূঢ় সারথি আজ্ঞা পালন করিল; আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। রাজা শুনিলে কিরূপ ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা ভাবিয়া সারথি মনে মনে প্রমাদ গণিল।

রথ নগরে প্রবেশ করিলে গৌতম চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সত্যিকার মানবজীবনের সহিত এই তাঁহার প্রথম পরিচয়। তিনি দেখিলেন রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই শিশুরা খেলিতেছে। বাজারের রাস্তার দুই পাশে সারি

সারি দোকানে দোকানীরা পসার খুলিয়া বসিয়াছে এবং খরিদ্দারদের সঙ্গে দরকষাকষি করিতেছে। জহুরী, কুমোর, কাঁসারী প্রভৃতি যাহার যাহার দোকানে বসিয়া কাজ করিতেছে। কোন শিক্ষনবিস হয়তো চাকা ঘুরাইতেছে। মুটেরা ভারী ভারী মোট লইয়া যাওয়া–আসা করিতেছে, – তাহাদের চেহারা শ্রান্ত–ক্লান্ত। ক্বচিৎ কখনো কোন সাধু রাস্তা দিয়া যাইতেছেন– হাতে দীর্ঘ দণ্ড, সর্বাঙ্গ ভস্মে সাদা! হ্যাংলা কুকুরেরা রাস্তার উপরেই খাদ্যদ্রব্যের টুকরা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। হয়তো গ্রামদেশ হইতে শস্য, ফল ও শাকসবজিতে বোঝাই গরুর গাড়ী তাহাদের উপরেই আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেদিকে কুকুরগুলির ভ্রূক্ষেপ নাই।

দু'চার জন বৃদ্ধ ব্যতীত রাস্তাতে মেয়েলোক বড় দেখা যাইতেছিল না; কারণ তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল হইয়াছে, মেয়েরা প্রাতঃস্নান সারিয়া তার আগেই বাড়ী গিয়াছে। ক্বচিৎ দু' একটি বালিকা দেখা যাইতেছিল; হয়তো কোন দেরী হইয়া গিয়াছে, মুখ ঘোমটাতে ঢাকা, মাথায় জলের কলসী লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও রাস্তাঘাটে সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। ভারতবর্ষে পুরুষেরা শাল কিংবা চাদর কাঁধে ঝুলাইয়া পরে। কাহারও চাদর কার্পাসের, কাহারও হলদে, কাহারও বেগুনী ইত্যাদি। মেয়েদের মৃদু পদ-নিক্কণের অভাবেও রাস্তা একেবারে সৌন্দর্যহীন হয় না। কারণ পুরুষের পোশাকেও বিচিত্র রঙের খেলা আছে এবং তাহারা সদা হাস্যময় ও মুখর। নগর দেখিতে দেখিতে গৌতম সারথিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন–**'আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি শ্রম, দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা। কিন্তু এগুলির সঙ্গে এত সৌন্দর্য, এত প্রেম, এত আনন্দ জড়িয়ে আছে যে, দুঃখ–দারিদ্র্য সত্ত্বেও জীবন বস্তুতঃ মধুর বলেই মনে হয়।'**

তিনি অত্যন্ত ভাবুকতা ও হৃদয়াবেগের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানবের ত্রিবিধ দুঃখ– জরা, রোগ ও মৃত্যু – মূর্তি ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দেখা দিল। গৌতমের জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হইল।

প্রথমে আসিল জরা। একজন অতি বৃদ্ধ অথর্ব ব্যক্তি আসিয়া গৌতমের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মাথায় একগাছিও চুল নাই, মাঢ়ীতে একটিও দাঁত নাই, হাত কেবলি কাঁপিতেছে। তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই;– চোখের জ্যোতিও বুঝি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার কান আর শুনিতে পায় না। জরা তাহার দেহকে এতদূর বিকল ও নিষ্ক্রিয় করিয়াছে যে, উহাকে আর আত্মার

যন্ত্র বলা যায় না। তাহার প্রাণ যেন নিরুপায়ভাবে জড়পিন্ডের মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। লাঠিতে ভর করিয়া একখানি অস্থি-চর্মসার হাত সে গৌতমের দিকে বাড়াইয়া দিল।

রাজকুমার তাহার দিকে ঝুঁকিয়া যত ধনরত্ন হাতে উঠে তাহাকে দিলেন। বৃদ্ধ এত পাইল যে, সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। গৌতমের মনে হইল যেন তাহার আত্মা বিষাদসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। ব্যগ্রভাবে তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন – **'এ কি? ছন্দক, লোকটার কি হয়েছে?'**

ছন্দক কহিল, **'কিছু নয়, রাজকুমার, লোকটা বৃদ্ধ হয়েছে– ওর অনেক বয়স হয়েছে– আর কিছুই হয়নি।'**

গৌতমের মনে হইল তাঁহার পিতা এবং অনেক অমাত্যও বৃদ্ধ হইয়াছেন– তাঁহাদের মাথার চুল সাদা হইয়াছে। তিনি ছন্দককে বলিলেন– **'বৃদ্ধ – সকল বৃদ্ধ তো দেখতে এ রকম নন।'**

ছন্দক উত্তর করিল–**'হ্যাঁ রাজকুমার,বেশী বুড়ো হলে সবাইকে এ রকম হতে হয়।'**

বিস্ময়ে এবং ভয়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন – **'তবে কি আমার পিতা, যশোধরা এবং আমিও এ রকম...?** সারথি গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, **'রাজকুমার, মানব–মাত্রেই জরার অধীন। খুব বেশী বয়স হলে সবাইকে এই বৃদ্ধের ন্যায় হতে হয়।'**

ভয় ও দুঃখের আতিশয্যে গৌতম চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল যাইতেই আরও ভয়ানক দৃশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রথের কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল, যাহার গায়ের চামড়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তামার রং ধরিয়াছে ভিক্ষার জন্য যে হাত সে বাড়াইল উহার অনেক অঙ্গুলি গলিয়া পড়িয়াছে। আমরা অনেকেই এই বীভৎস দৃশ্য দেখিলে ভয়ে চোখ ঢাকিয়া সেখান হইতে পালাইতাম। কিন্তু রাজকুমারের ভয় কিংবা ঘৃণা হইল না। তাঁহার হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। অত্যন্ত স্নেহার্দ্র স্বরে তিনি তাহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং একটি মুদ্রা তাহার হাতে দিলেন। গৌতমের দয়া দেখিয়া এবং মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া লোকটি বিস্ময়ে নির্বাক হইল। ছন্দক ব্যস্তভাবে কহিল, **'রাজকুমার, এ লোকটি কুষ্ঠরোগী। এখানে দাঁড়ানো উচিত নয়; আমি তাড়াতাড়ি রথ চালিয়ে যাচ্ছি।'**

গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকটির কি হয়েছে, ছন্দক?'

'যুবরাজ, লোকটি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।'

'ব্যাধি? ব্যাধি কি, ছন্দক?'

'কুমার, ব্যাধি অথবা রোগ মানুষের শরীরকে আক্রমণ করে। কেন করে – কিরূপে করে– আমরা তা জানি না। রোগ হলে শরীরের সোয়াস্তি নষ্ট হয়। রুগ্নব্যক্তি প্রচন্ড গ্রীষ্মেও শীত অনুভব করে, আবার বরফের পাহাড়ে থেকেও গরমে ছটফট করে। কেহ বা রোগের আক্রমণে অসাড় হয়ে ঘুমোয়; কেহ বা ব্যাধির তাড়নে পাগলের ন্যায় অস্থির হয়ে বেড়ায়। কোন ক্ষেত্রে ব্যাধির বিষে অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে গলে পড়ে– কোন ক্ষেত্রে বা শরীর কেবলি শুকোয় যে পর্যন্ত না চামড়ার থলির ভিতরে হাড়গুলি স্পষ্ট দেখা যায়। আবার এমনও হয় রোগ শরীরকে ফুলিয়ে কিম্ভুত–কিমাকার করে তোলে।এরি নাম ব্যাধি। ইহা কি করে আসে তা কেউ জানে না। কোন্ মুহূর্তে ইহা আমাদিগকে আক্রমণ করবে তা আগে থাকতে আমরা জানতে পারি না।'

'হায়! এই কি জীবন? একটু আগেও আমি ভাবছিলাম জীবন কী মধুর!' এই কথা বলিয়া গৌতম চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে ছন্দকের দিকে চাহিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, **'জীবন হ'তে লোক কি ক'রে নিষ্কৃতি পায়? দুঃখের দশা হ'তে কে তাদের মোচন করে?'** ছন্দক কহিল– 'মৃত্যু। ঐ দেখুন, কুমার, কয়েক জন লোক একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নদীতীরে গিয়ে ওটাকে পোড়াবে।'

গৌতম দেখিলেন চারজন লোক একটা নীচু চারপাই কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। চারপাইয়ের উপর সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা একটা মানুষের আকৃতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেই আকৃতিতে কোন নড়াচড়া নাই; – বহনকারীরা হোঁচট খাইলেও চাদরের নীচে কেহ নড়িয়া উঠে না। বাহকেরা বারবার 'হরিবোল' বলিতেছিল। কিন্তু যাহার উদেশ্যে এই 'হরিবোল'– সে কোন সাড়া দেয় না।

সারথি গম্ভীরভাবে বলিল, 'কিন্তু মৃত্যু যদিও জীবনের জ্বালা জুড়োয়, তথাপি মৃত্যুকে মানুষ চায় না– ভালবাসে না। মৃত্যুকে মানব বন্ধু ব'লে মনে করে না– বরং মনে করে উহা জরা কিংবা রোগের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর শত্রু। মৃত্যু অতর্কিতে মানুষকে পাকড়াও করে, মানুষ উহাকে ভয় করে, ঘৃণা করে;– উহার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।'

শবযাত্রা গৌতম খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার অর্ন্ত দৃষ্টি খুলিয়া গেল, তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন কেন মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া যেন পর পর অনেক চিত্রপট চলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, যে মৃতলোকটি তাঁহার সামনে দিয়া চলিয়া গেল, সে আরও অনেক জন্ম পার হইয়াছে– অনেকবার সে জন্মিয়াছে এবং মরিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, একবার মৃত্যুর পরেও সে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে আসিবে। 'জন্মিলে মরিতে হয়, মরিলে জনম।' তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ছন্দক, বুঝলাম– সংসার-চক্র কেবলি ঘুরছে; জীবনের আদি-অন্ত নেই। তাড়াতাড়ি ঘরে চল।

সারথি রথ ঘরের দিকে ফিরাইল। গৌতম আর কিছু বলিলেন না। তিনি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। প্রাসাদে ফিরিয়া গৌতম নূতন দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে লাগিলেন। আগে যাহা তাঁহার নিকট সুন্দর ও উপভোগ্য ছিল, তাহা এখন ঘৃণার বস্তু হইল। সবুজ ঘাসের গালিচা, মনোরম পুষ্পোদ্যান, কলনাদিনী স্রোতস্বতী– সকলি মনে হইল ছেলে–ভুলানো খেলনা; – এগুলি এতদিন তাঁহার নিকট হইতে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গৌতমের মনে হইল তিনি এবং যশোধরা এতদিন যে উদ্যানে শিশুর ন্যায় খেলা করিয়াছেন, তাহার নীচে ভয়ানক আগ্নেয়গিরি। যে কোন মূহুর্তে তাঁহাদের খেলাঘর অগ্ন্যুদগারে ধ্বংস হইতে পারে। এই সম্ভাবনা শুধু তাঁহাদের দুজনের জন্যই নহে;সকলের জন্যই এই বিপদ – সংসারে কাহারও ভোগে মত্ত হইবার হেতু নাই।

সমস্ত মানবজাতির জন্য– আর শুধু মানব কেন– সমস্ত জীবের জন্য গৌতমের হৃদয় করুণায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, **'জীবন ও মৃত্যু একটা দুঃস্বপ্ন। কিরূপে আমরা এদের হাত এড়িয়ে মোহনিদ্রা হতে জাগতে পারি?'**

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া মানবের ত্রিবিধ দুঃখ গৌতমকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার আহার নিদ্রা সমস্ত দূরে গেল।

গভীর নিশীথে যখন সমস্ত রাজপুরী নিদ্রামগ্ন তখন গৌতম শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ঘরের ভিতরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটি বাতায়ন খুলিয়া তিনি বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। গাছের সারির ভিতর দিয়া মর্মরশব্দে বাতাস বহিয়া গেল– মনে হইল যেন পৃথিবী শিহরিয়া উঠিল। বস্তুতঃ উহা ছিল বিশ্বের সমস্ত আত্মার আকুল ক্রন্দন। যাহারা

বলিতেছিল, 'হে গৌতম, জাগো। তুমি জ্ঞানী, তুমি বুদ্ধ। ওঠ, জগৎকে উদ্ধার কর।' রাজকুমার সেই আকুল বাণী অবশ্যই শুনিলেন এবং বুঝিলেন। বাহিরে নিস্তব্ধ তারকারাজির দিকে চাহিয়া তিনি মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্বজাতির সনাতন জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হইয়া উঠিল। **'কেন আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি? নিশ্চয়ই এই জ্ঞানের সন্ধানেই বহু লোক ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে যায়,- গায়ে ভস্ম মাখে। তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু - না - কিছু সত্যের সন্ধান পান। তা হলে তাঁদের পথই আসল পথ। আমিও সেই পথ ধরেই চলবো। কিন্তু এঁরা তো লোকালয়ে ফিরে এসে নিজেদের লব্ধ সত্য প্রচার করেন না। তাঁরা নিজেদের মধ্যেই সত্যকে গোপন রাখেন, কিংবা শুধু দু'একজন পন্ডিত ব্যক্তিকে কিছু কিছু বলেন। আমি যদি জগতের রহস্য ভেদ করতে পারি তবে তা লুকিয়ে রাখবো না; ফিরে এসে সমগ্র মানবজাতির নিকট তা প্রচার করবো। যেমন পন্ডিতকে বলবো - তেমনি যে হীনের চেয়েও হীন তাকেও আমি বলবো। মুক্তির পথ সমগ্র জগতের জন্য নির্বিচারে খুলে দেবো।'** মনে মনে এই প্রকার বলিয়া গৌতম জানালা বন্ধ করিলেন, এবং চুপি চুপি তাঁহার ঘুমন্ত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে গেলেন।

অতি সন্তর্পণে তিনি পর্দা সরাইয়া যশোধরার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। তখনি যেন তাঁহার মনের ভিতরে সত্যিকার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ধর্মপত্নীকে ছাড়িয়া যাইবার কোন অধিকার তাঁহার আছে কি? হয়তো তিনি চিরতরে যাইতেছেন- আর কখনও ফিরিবেন না। স্ত্রীর উপর বৈধব্য আনয়ন করা ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজ হইবে না কি? তাঁহার নবজাত পুত্রকেও পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইতে হইবে। বিশ্বের জন্য নিজকে বলি দেওয়া খুব ভাল কাজ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার কী অধিকার যে তিনি স্ত্রী-পুত্রকেও বলি দেন?

গৌতম পর্দাগুলি টানিয়া দিলেন এবং আবার জানালার নিকটে গেলেন। বাহিরের দিকে তাকাইয়া তিনি যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, যশোধরা তো সামান্য স্ত্রীলোক নহেন। যশোধরার উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় তো তিনি অনেক পাইয়াছেন। গৌতমের মনে হইল তিনি যে আত্মোৎসর্গ করিতে যাইতেছেন তাহাতে যশোধরারও ভাগ আছে। যশোধরার বিহনে গৌতমের যে দুঃখ হইবে তাহার ফলেই তিনি স্বামীর তপস্যার ও জ্ঞানের অর্ধেক ভাগ পাইবেন।

তাঁহার মনে আর কোন দ্বিধা-সংশয় রহিল না। বিদায় লইবার জন্য তিনি আবার পত্নীর শয্যাপার্শ্বে গেলেন। আবার তিনি যশোধরার শান্ত মুখশ্রী অবলোকন করিলেন। পত্নীকে জাগাইতে গৌতমের সাহস হইল না; নুইয়া তিনি অতি ধীরে তাহার পদচুম্বন করিলেন। যশোধরা ঘুমের ঘোরে ফোপাইয়া কাঁদিলেন। গৌতম তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

নীচের তলায় গিয়া গৌতম সারথি ছন্দককে ঠেলিয়া জাগাইলেন। নিঃশব্দে রথ প্রস্তুত হইল। আস্তে আস্তে এবং চোরের ন্যায় রথ রাজপুরীর ফটকগুলি একে একে পার হইয়া সদর রাস্তায় পড়িতেই রথের ঘোড়া তীরবেগে ছুটিল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই রাজকুমার বহু ক্রোশ গিয়া পৌঁছিলেন।

প্রভাতে রথ থামাইয়া রাজকুমার নামিলেন। তৎপরে গাত্র হইতে তিনি বহুমূল্য আভরণ সমস্তই খুলিলেন। বস্ত্র মণি মুক্তা প্রভৃতি পরিজনবর্গের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ছন্দকের হাতে দিয়া কোনটি কাহাকে দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। গৌতম নিজে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিলেন– পরিধানে গৈরিক, গায়ে ভস্মাচ্ছাদন, হাতে দন্ড কমন্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র। ছন্দক আর স্থির থাকিতে পারিল না; অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। **'পিতাকে বলো আমি আসবো'**– এই সংক্ষিপ্ত বিদায়- বাণী বলিয়া গৌতম নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার অদৃশ্য হইবার পরেও ছন্দক যেখানে ছিল সেখানে স্থাণুর ন্যায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে একান্ত ভক্তিভরে সেই জায়গার ধূলি লইয়া নিজের মাথায় ধারণ করিল। তারপর নিতান্ত ক্ষুন্ন মনে ছন্দক বাড়ীর দিকে রথ চালাইল রাজাকে সংবাদ দিবার জন্য।

দীর্ঘ সাত বৎসর গৌতম সত্যের অনুসন্ধানে নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট গেলেন; অনেক কঠোর তপস্যা করিলেন। অবশেষে একদা রাত্রিতে যখন এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন তখন সেই মহাক্ষণে জগৎ– রহস্য তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিখিল জ্ঞান তাঁহার নিকট ধরা দিল। তখন হইতে তাঁহার পুরাতন নাম বিলুপ্ত হইল, তিনি 'বুদ্ধ'(অর্থাৎ সম্যক্-জ্ঞানী) নামেই পরিচিত হইলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের মহাক্ষণে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তৃষ্ণাই দুঃখের মূল। ভোগবাসনার তৃষ্ণাই জীবকে সংসার-চক্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং অশেষ যন্ত্রণা দেয়। তৃষ্ণা ছাড়িলেই মানব মুক্ত হইতে পারে। মুক্তির নাম

দিলেন 'নির্বাণ' এবং যে পথে চলিলে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার নাম দিলেন 'শান্তিমার্গ'।

এখন যে স্থান 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিত সেখানেই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে এবং উহার পাশে আছে 'বোধিদ্রুম'। যে বৃক্ষের তলে গৌতম জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বর্তমান বোধিদ্রুম তাহারি একটি শাখা হইতে জাত। বুদ্ধত্ব লাভের পরেও সিদ্ধার্থ কয়েক দিন পর্যন্ত সেই স্থানেই রহিলেন, এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। বুদ্ধগয়া ছাড়িয়া প্রথমেই তিনি বারাণসীর নিকটে 'মৃগদাব,(বর্তমান 'সারনাথ,) নামক স্থানে গেলেন এবং সেখানে পাঁচশত সন্ন্যাসীর সমক্ষে নিজ মত প্রচার করিলেন। তখন হইতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহার বহু শিষ্য জুটিতে লাগিল। কপিলাবস্তু–যাত্রী দুই সওদাগরের নাগাল পাইয়া গৌতম তাঁহার পিতা ও পত্নীকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি অচিরে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে গৌতমের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ রাজা এবং যশোধরার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শুদ্ধোদন রাজপুরী সুসজ্জিত করিলেন এবং সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত রাখিলেন। গৌতমের আগমন– প্রতীক্ষায় নগরের সমস্ত লোক যখন রাস্তার দুইপাশে নিশান, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অশ্বারোহী সৈন্যেরা যখন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিল তখন দেখা গেল সর্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং ভিক্ষাপাত্র-করে এক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। তিনি রাজার সম্মুখ দিয়া গেলেন। ইনিই তো সেই গৌতম,যিনি সাত বছর আগে নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ 'বুদ্ধ' হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন!

বুদ্ধ থামিলেন না। তিনি সরাসরি রাজ প্রাসাদে ঢুকিয়া একেবারে নিজের কামরায় গিয়া স্ত্রী-পুত্রের সম্মুখে হাজির হইলেন। যশোধরাও গৈরিক–পরিহিতা! যে প্রভাতে জাগিয়া তিনি জানিলেন গৌতম গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেদিন হইতেই রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিলেন। তিনি শুধু ফলমুল খাইতেন এবং ভূমিশয্যায় শুইতেন। সমস্ত অলঙ্কার-পত্র তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

যশোধরা নতজানু হইয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন– তাঁহার বাঁদিকের বস্ত্রখন্ড চুম্বন করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা অতি অল্পই

হইল। বুদ্ধ যশোধরাকে আশীর্বাদ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। তখন যেন যশোধরা স্বপ্ন হইতে জাগিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন– **'যাও বাছা, শীগ্‌গির যাও, তোমার পিতার নিকট থেকে তোমার উত্তরাধিকার চেয়ে নাও গে।'**

মুন্ডিত মস্তক ও গৈরিক–পরিহিত অনেক লোককে একত্র দেখিয়া বালক থতমত খাইয়াছিল। সভয়ে বলিল, **'মা, কোনব্যক্তি আমার পিতা?'**

যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন না, কিংবা তাঁহার পোশাক ও চেহারা কিছুই বর্ণনা করিলেন না। শুধু কহিলেন, **'জনতার মধ্যে যিনি সিংহতুল্য, তিনিই তোমার পিতা।'**

বালক তখন সোজা বুদ্ধের নিকট গিয়া কহিল, **'বাবা, আমার উত্তরাধিকার কি দেবেন দিন।'** বালক তিনবার একথা বলিবার পর বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, **"দিতে পারি কি?'** বুদ্ধ বলিলেন, **'দাও।'** আনন্দ তখন বালককে গৈরিক বসন পরাইয়া দিলেন।

তখন তাঁহারা পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন বালকের মাতাও নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকিলেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইতে চাহেন। কোমল–হৃদয় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, **'প্রভু, স্ত্রীলোকেরা কি সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা কি আমাদের ন্যায় অধিকারী হতে পারেন না?'**

বুদ্ধ উত্তর করিলেন– **'এ প্রশ্ন কেন, আনন্দ? স্ত্রীলোকেরাও কি ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করেন না? তাঁহারা কেন শান্তিমার্গে চলতে পারবেন না? আমার ধর্ম, আমার সঙ্ঘ সকলের জন্য। আনন্দ, তবুও এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ভালই করেছ।'**

যশোধরাও সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন এবং বুদ্ধের বাসস্থানের নিকটে থাকিবার অনুমতি পাইলেন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটিল। তিনিও শান্তি–পথের যাত্রী হইলেন।

–ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংযোজিত

গৌতম-প্রয়াণ

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল,
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর,
নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরী ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিলীম নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছে বিরহ-স্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য নয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট,এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
অরুণ তোমার তরুণ অধর
করুণ তোমার আঁখি
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারেবার
আমারে ডাকিছে সবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্ম পর
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।
কিসেরি বা সুখ, ক ' দিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধ ঃ এক আলোক বর্তিকা

–আবুল ফজল

বুদ্ধকে অন্য এক লেখায় আমি 'মানব পুত্র' বলেছি। কথাটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ। আর সে অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং সার্বিক। মানব স্বভাবের এত গভীরে অন্য কেউ প্রবেশ করেছে কিনা আমার জানা নেই। সত্যের সন্ধানে তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করেছেন; কিন্তু প্রচলিত আত্ম–নির্যাতন–মূলক সন্ন্যাসকে করেছেন নিন্দা। মানুষের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু অতিরেক আর অভিচারকে করেছেন নিষিদ্ধ। মানুষকে হতে বলেছেন মধ্যেপন্থের অনুসারী। আর বলেছেন, এই হচ্ছে 'প্রজ্ঞা পারমিতা'য় পৌঁছার পথ। 'প্রজ্ঞা পারমিতা' মানে পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা তথা Supreme wisdom- †যখানে ভুল-ভ্রান্তির নেই কোন অনুপ্রবেশ।

প্রাণের অধিকারী বলে মানূষও প্রাণী–প্রাণহীন মানুষ স্রেফ জড়বস্তু, তখন জড়বস্তু বেশী তার আর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই প্রাণ এক অমূল্য সম্পদ, এক দুর্লভ ধন। মানুষই শুধু প্রাণের অধিকারী নয়– আরো অজস্র প্রাণী রয়েছে মর্ত্যধামে। বুদ্ধি আর বিজ্ঞতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ যুক্তি– যুক্তি বলে সব প্রাণই অমূল্য, শুধু মানুষের প্রাণটাই মূল্যবান এ বুদ্ধি কিম্বা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। অবিশ্বাস্য সাধনা আর দীর্ঘ আত্মনিবিষ্ট ধ্যানে মহামানব বুদ্ধ এ'মহা সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, সব প্রাণই মূল্যবান, সব প্রাণই পবিত্র। প্রাণ–হনন এক গর্হিত কর্ম। সর্ব জীবে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম,–এমন কথা আড়াই হাজার বছর আগে সত্যই অকল্পনীয় ছিল। মানব সভ্যতার তখনো শৈশবাবস্থা- জীবহত্যা তথা প্রাণী–শিকার তখনো তার অন্যতম জীবিকা। যুবরাজ সিদ্ধার্থই ছিলেন এর প্রথম অপবাদক। তখন বীরত্বের বা ক্ষত্রিয় ধর্মের পারাকাষ্ঠাই ছিল মৃগয়া বা পশু– শিকার। সিদ্ধার্থও ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশাবতংস।

তাই, ভেবে অবাক হতে হয় তেমন যুগে তেমন পরিবেশে কি করে একটা মানুষের এমন রূপান্তর ঘটলো। কোন অলৌকিক কিম্বা অপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় তিনি নেননি, যাননি তেমন অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অপ্রামাণ্য শক্তির কাছে সর্বতোভাবে নির্ভর করেছেন আত্মশক্তির উপর, নিজের সাধনা আর অত্মোপলব্ধির উপর। আত্মোন্মোচন ঘটেছে তাঁর এভাবে।

এভাবে ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম পৌঁছেছেন বুদ্ধত্বে। মানবিক সাধনার এক চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ–জীবন। ত্যাগ–সংযমের পথে যে সাধনা তাই মূল্যবান ও ফলপ্রসূ। স্রেফ উপাসনা কিম্বা কর্মহীন প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, তা শুধু নিষ্ক্রিয়তা আর জড় অভ্যাসেরই দিয়ে থাকে প্রশ্রয়। এতে কোন আত্মোন্নতি ঘটেনা, ঘটেনা কোন রকম আত্মোপলব্ধি। অপরিসীম আর অবিরাম চেষ্টা আর উদ্যম–উদ্যোগ ছাড়া আত্মোন্নতি কিম্বা আত্মোপলব্ধির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধিরই এক নাম প্রজ্ঞা। অন্যান্য বহু ধর্মের বিশ্বাসে রয়েছে এক বড় স্থান, অত্যন্ত জোর দেওয়া হয় ঐসব ধর্মে। বুদ্ধ তা করেননি। তাঁর মতে কর্মহীন উপাসনা যেমন নিষ্ফল তেমনি নিষ্ক্রিয় জড় বিশ্বাসও মূল্যহীন। মানুষের যা কিছু উপার্জন তা কর্মোদ্যমের পথে লভ্য। জ্ঞানের তথা প্রজ্ঞা–পারমিতার যে আলোক–বর্তিকা বুদ্ধ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাও তিনি লাভ করেছেন এ পথেই। মনে হয় বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে– ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেননি। তাঁর জীবন ও শিক্ষা ব্যক্তিগত সাধনারই জয় ঘোষণা। আত্মোপলব্ধির তথা প্রজ্ঞা–পারমিতায় পৌঁছার জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সবের দিকে তাকালেও বুঝতে পারা যাবে তিনি সর্বতোভাবে ব্যক্তিক সাধনার উপর দিয়েছেন জোর। দল বা সমাজবদ্ধভাবে আত্ম–উন্নতি ঘটেনা, আত্ম–উন্নতি ঘটে ব্যক্তিগত চেষ্টা, শ্রম আর সংযমের পথে। তাঁর নির্দেশিত পঞ্চশীলের সবক'টা শীলই ব্যক্তিগতভাবে আচরণীয় ও পালনীয়। প্রণীহত্যা পরস্বাপহরণ, অবৈধ যৌন সম্ভোগ না করা, মিথ্যা পরনিন্দা কিম্বা রূঢ় কথা না বলা, মদ আর নেশাজনক বস্তু গ্রহণ না করা– ব্যক্তিগত জীবনে সংযম আর ত্যাগ ছাড়া এসব হওয়ার নয়। আনুষ্ঠানিক উপাসনা আর প্রার্থনার সাহায্যে এ'সব আয়ত্ব হতে পারে না কিছুতেই।

বুদ্ধের এ'সব নির্দেশ পালন খুব কঠিন বটে কিন্তু এতে কোন রকম জটিলতা কিম্বা দুর্জ্ঞেয়তা নেই, এ অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। রহস্য–ঘেরা দার্শনিক জটিলতাকে বুদ্ধ কোনদিন দেননি প্রশ্রয়। যেমন অনেক ধর্মের কোন কোন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তোলেন ঃ মানুষ কে, কি? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এ ধরণের অর্থহীন তথা উত্তর– বিহীন প্রশ্নকে বুদ্ধ কখনো আমল দেননি। এসব পশ্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু পারে না তাকে সৎ–জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বুদ্ধের তাবৎ শিক্ষার মূল

লক্ষ্য সৎ-মানুষ সৎ-জীবনের পথ-নির্দেশ। চেষ্টা আর উদ্যমের ফলে ক্রমাগতই মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মানস-জীবনে বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রাচীন বহু বিশ্বাস আর সংস্কার ত্যাগ করে মানুষ এখন অধিকতর আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রগামী। একদিন মানুষ জল বাতাস অগ্নি আর চন্দ্র-সূর্যকে, এমনকি বজ্র আর মেঘগর্জনকেও দেবতা মানতো। কিন্তু এখন মানে না কেন? কারণ এখন মানুষের বোধ আর বোধি অনেক বেড়েছে, কালের সঙ্গে সঙ্গে তার মানস জীবন হয়েছে অনেক উন্নত। বুদ্ধের শিক্ষা আর নির্দেশ জীবনে গ্রহণ করা হলে মানুষের আরো যে আত্মবিকাশ ঘটবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। এও বুদ্ধের এক অবিনশ্বর বাণী। এভাবে অতিপ্রাকৃত ও পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে তিনি মানুষকে দিয়েছেন মুক্তি।

কথা আছেঃ মানুষ প্রবৃত্তির দাস। এ দাসত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া মানুষ কখনো পরিপূর্ণ বোধ আর বোধিতে পৌঁছতে পারে না। একমাত্র আত্মশুদ্ধির পথেই এ দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব-সে পথের নির্দেশ রয়েছে বুদ্ধ-জীবনে, বুদ্ধের শিক্ষা আর বিধি-বিধানে, আদেশ আর নিষেধে।

মানুষ এখন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক সভ্য হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। তবুও পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। সংকটে,সংঘর্ষে পৃথিবী আজ জর্জরিত। যুদ্ধ-বিগ্রহে আর এসব মারামারি, খুনোখুনিতে যে হারছে তার যেমন শান্তি নেই তেমনি শান্তি নেই যে জয়ী হচেছ তারও। ব্যক্তির বেলায় যেমন এ সত্য তেমনি দেশ ও জাতির বেলায়ও এ একবিন্দু মিথ্যা নয়। বুদ্ধ-শিষ্য অশোক জীবনের এ মহাসত্য দু'হাজার বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মন্ত্র-গুরু বুদ্ধের জীবনাদর্শ আর শিক্ষার আলোয়। তাই বিজয়ী হয়েও জয়ের ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ত্যাগ আর অহিংসার জীবনকে নিয়েছিলেন বরণ করে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

বুদ্ধ-জীবন মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর আলোক- বর্তিকা- এ আলোক-বর্তিকা একদিন সম্রাট অশোককে যেমন সত্য, মনুষ্যত্ব আর শান্তির পথ দেখিয়েছিল, আজকের দিনেও সে পথ দেখাতে তা সক্ষম যদি

মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে এ আলোক-বর্তিকার দিকে নতুন করে ফিরে তাকায় আর বরণ করে নেয় তাঁকে সর্বান্তকরণে।

বুদ্ধ আর বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের অর্থাৎ অ-বৌদ্ধদের মনে একটা রহস্য-ঘন বিস্ময় রয়েছে। এ বিস্ময়ের বড় কারণ অপরিচয়। বৌদ্ধ-বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যারা জন্মাননি তাঁহাদের কাছে বুদ্ধজীবন আর বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়-বিরাট বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের মহাসমুদ্র মন্থনের যোগ্যতা, ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা আমাদের অনেকেরই নেই। ফলে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে আমরা থেকে যাই অজ্ঞ। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় বহু অবিশ্বাস আর সংশয়-সন্দেহের-যা কালক্রমে ঘৃণা-বিদ্বেষ,দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর নানা অশুভ ক্রিয়া-কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম-বিশ্বাস ও চেতনা মানুষের গভীরতম সত্তার সঙ্গে জড়িত-তাই কোন মানুষকে সম্যকভাবে জানতে হলে তার এ সত্তার সঙ্গেও পরিচয় অত্যাবশ্যক। সে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে যেমন নেই তেমনি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও তার অনুকূল নয়।এর ফলে আমাদের জ্ঞান যে খন্ডিত থেকে যায় তা নয়, একটা সুসংহত জাতি কিম্বা সমাজ সত্তা গড়ে ওঠার পথেও আমাদের দেশে এ হয়ে আছে এক দূরতিক্রম্য বাঁধা। অন্ততঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান তথা ধর্মীয় গোঁড়ামী অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সব ধর্মাবলম্বীরাই এ অপরাধে অপরাধী।

মহামানব বুদ্ধের জীবন আর তাঁর শিক্ষা আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর মানবিকতার জন্য। মানব চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে তিনি একদিকে খুঁজে বের করেছেন তাঁর ক্লেদ, গ্লানি, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অন্যদিকে আবিষ্কার করেছেন অসীম শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনার বীজ -যা অংকুরিত হয়ে রূপ নিতে সক্ষম 'প্রজ্ঞা- পারমিতায়' অর্থাৎ পূর্নবিজ্ঞতায়। মানবিক শত বন্ধনে মানুষ বাঁধা যা সর্ব দু:খ কষ্ট আর শোক-সন্তাপের উৎস- এ বন্ধন মুক্তির উপায় ও পথ বাৎলিয়েছেন বুদ্ধ। ইংরেজিতে একটি কথা, যার অর্থ: মানুষকে অধ্যয়ন করেই জানতে হয় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে জানার প্রধানতম উপায় মানুষকে জানা, মানুষকে অধ্যয়ন করা।

মহাপুরুষ বুদ্ধ তাই করেছেন। মানুষকে অধ্যয়ন করেই তিনি জেনেছেন মানুষের মুক্তির নিদান। প্রজ্ঞার বিদ্যুৎঝলক যে তাঁর মনে সর্ব প্রথম ঝলসে উঠেছিল সে-ও তো পীড়িত, জরাগ্রস্ত আর মৃত মানুষকে দেখেই। যার

ফলে মূহুর্তে শুধু তাঁর অন্তর্লোকে সত্যের, করুণার আর প্রেমের এমন এক সূর্য-করোজ্জ্বল দীপ্তি যার কোন তুলনা হয় না। এ মহাসত্যের পথ ধরেই শুরু হলো তাঁর সাধনা- যে সাধনার লক্ষ্যে মানুষ আর মানুষের অন্তর্জীবন এবং তার রহস্য সন্ধান। সে সন্ধানে তিনি সফল হয়েছেন। হয়েছেন 'জিন' বা জয়ী। মানব সভ্যতার সূচনার যুগে এ সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এক রাজপুত্র, সুন্দরী স্ত্রী আর সদ্যজাত সন্তানকে জীবনের জন্য ছেড়ে সত্যের ও মানব মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে এক দুঃসহ বন জীবন বরণ করে নিয়েছেন মানুষের জন্য। এতো এক অত্যাশ্চার্য শিহরণ। হয়তো মহাপুরুষদের জীবন এমনি অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়ই হয়ে থাকে। না হয় তাঁরা মহাপুরুষ হলেন কি করে?

বুদ্ধ -জীবনের মতো ত্যাগ- সাধনা আর মনুষ্যত্বোপলব্ধীর এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

বুদ্ধের শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য নির্বাণ। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস- এদাসত্বের চেয়ে হীনতম দাসত্ব আর নেই। এ বন্ধন মোচনের বাণীই তিনি শুনিয়েছেন মানুষকে। এ ছাড়া ভব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই। ভব- যন্ত্রণার হাত থেকেই চির মুক্তিরই এক নাম নির্বাণ, 'বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ'- এমন আপ্তবাক্যে বুদ্ধ বিশ্বাস করেন না। কর্মহীন বিশ্বাসতো স্রেফ নিষ্ক্রিয়তা, এতে প্রশ্রয় পায় জড়তা, শ্রম-বিমুখতা। বুদ্ধের শিক্ষা আর ধর্মের মর্মকথাই হলো-অবিরত আর অবিচলিত চেষ্টা। তিনি নিন্দা করেছন অজ্ঞতা, লোভ আর হিংসা-বিদ্বেষকে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এসবকে জড়শুদ্ধ উৎপাটিত করার দিয়েছেন নির্দেশ। শুধু বিশ্বাস বা উপাস্য কিম্বা আরাধ্যের নাম জপ করলে এ হওয়ার নয়। তাই বিশ্বাস কি উপাসনার উপর তিনি মোটেও জোর দেননি। কারণ ঐ সবের মধ্যে ব্যাক্তির কোন প্রচেষ্টা নেই, নিজেকে রূপান্তরিত করার নেই কোন প্রয়াস। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, গড়ে তোলে তার চিন্তা, তার কথা; তার কর্ম। জড় অভ্যাস নয়। তাই মানুষ বিশ্বাসে তোতা পাখি হোক বুদ্ধ এ কখনো চাননি। মানুষ সক্রিয় হোক। প্রয়াসী আর উদ্যোগী হোক এই তিনি চেয়েছেন, দিয়েছেন তেমন বিধান। সন্ন্যাস এ সবের বিপরীত, সন্ন্যাসও এ রকম জড়তা। তাই কৃচ্ছ সাধনা ও সন্ন্যাস জীবনকেও তিনি করেছেন নিন্দা। সন্ন্যাস আত্মরতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলে অহংবোধ। এ সবের অসারতা বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলেছেন- অকারণে শারীরিক কষ্ট ভোগ কখনো

মুক্তির পথ নয়। নয় শান্তি কিম্বা প্রজ্ঞার পথ। মানব মনের উন্মেষ আর বিকাশ যেখানেই ঘটেছে, তা সবই চেষ্টা, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের পথেই হয়েছে, তারই ফল এ সব। স্রেফ উপাসনার দ্বারা এ সবের কিছুই হয়নি। এ যাবত মানব সভ্যতার যা কিছু উন্নতি, তার সবই কর্ম, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের ফল। বুদ্ধের নিজের জীবনও ছিল তাই। এ পথেই তিনি মানব-মুক্তির মহাসনদ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীতে প্রাণের চেয়ে দূর্লভ সম্পদ আর নেই- তাই প্রাণ হননের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষধ তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বাগ্রে। তিনি যে শুধু অহিংসা মন্ত্রই পৃথিবীকে শুনিয়েছেন তা নয়, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন কর্ম উদ্যমের বাণীও। ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে সম্ভবত: একমাত্র তিনি এমন দু:সাহসী কথা বলেছেন: Prayer is useless , for what is required is effort. The time spent on prayer is lost and the time spent on effort to achieve something is not lost. অর্থাৎ স্রেফ উপাসনায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা নিষ্ফল কিন্তু কোন কিছু উপার্জনের প্রচেষ্টায় যে সময় ব্যয় করা হয় তাই ফলপ্রসূ।

এ মহামানব সব রকম সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাই মানুষের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বানঃ দূর করো পুরানো সংস্কারকে, বরণ করে নাও নতুনকে, পরিহার করো পাপ, শ্রেয়কে করো সঞ্চয়। সব রকম পাপ আর বাসনা- কামনার বিরুদ্ধে করো বীর বিক্রমে সংগ্রাম। বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ সকলের দৃষ্টি, এ মহৎ বাণীর প্রতি আবার নতুন করে আকৃষ্ট হোক।

* প্রবন্ধটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) বিরচিত 'মানবপুত্র বুদ্ধ' পালিবুক সোসাইটি, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে সংকলিত।

বৌদ্ধদর্শনে অনাত্মবাদ

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সকল প্রকার দুষ্কর্মের ও দুস্প্রবৃত্তির মূলে আত্মবাদকে কারণ রূপে স্বীকার করে আত্মাকে এক স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মানসিক অনুভূতি ও বিভিন্ন প্রবৃতিকে স্বীকার করতেন এবং আত্মাকে তাদের সংঘাত ছাড়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করতেন না। সর্বব্যাপক, চির শাশ্বতঃ, আত্মা মানাকে বুদ্ধ বালধর্ম বলেছেন। আত্মা বা জীবন হল মানসিক প্রক্রিয়ার অবিরাম ধারা প্রবাহ। এই মানসিক ধারা প্রবাহই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হতেছে। এভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে একটা ধারাবহিকতার স্রোত বয়ে চলেছে, যার জন্য কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। তাদের এই সিদ্ধান্তই আজকালকার মনোবৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা মানস প্রবৃত্তি সমূহকে স্বীকার করে নিলেও একিকরণাত্বক আত্মসত্তাকে স্বীকার করেননি। তাঁদের এই সিদ্ধান্তই অনাত্মবাদ বৌদ্ধ দর্শন হতে গৃহীতঃ কারণ বুদ্ধইতো সর্ব প্রথম অনাত্মবাদ সীদ্ধান্ত প্রচার করে জগতে এক দুঃসাহসীক কার্য করেছেন। তিনি কোনদিন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেননি, তাঁর মতে জাগতিক বস্তু সমূহ নামরূপের সমষ্টি মাত্র। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু; এই চারি মহাভূতের সমষ্টিই রূপ আর মানসিক (চিত্ত-চৈতসিক) অংশই নাম, যেমন- বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই নামরূপের সমষ্টিই জাগতিক বস্তু সৃষ্টি। অতি প্রাচীনকাল হতে মানুষ তার ভৌতিক ও মানসিক সমষ্টির প্রতি **'আমিত্ব'** বা অহং প্রত্যয়ই আরোপ করে আসতেছে। আত্মা সেই অহং প্রত্যয়ের বাচক। এই অহং প্রত্যয়ই পরবর্তীকালে আত্মা নামে কল্পিত হয়েছে। এর বাস্তবতা প্রমাণের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের বিপুল প্রয়াস। আত্মার প্রতি মানুষের বিশ্বাস সুদৃঢ় করবার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুপারিশ করা হয়েছে- **'যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করে, সে দেবতাগণের গৃহপালিত পশু বিশেষ।'** এই ধরনের দৃষ্টান্তের অবধি নাই। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এর বাস্তবতা স্বীকৃত হয় নাই; যেহেতু সব কিছু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, সেহেতু কোন শাশ্বতঃ আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। অনাত্ম লক্ষণ আয়াসসাধ্য, কারণ অনাত্ম লক্ষণ অপ্রকট, দুরধিগম্য এবং উক্ত মত প্রতিষ্ঠা করাও দু:সাধ্য যেহেতু আত্মার

অস্তিত্ব অবিদ্যমান। আলো আঁধারের ন্যায় পরস্পর পক্ষ- প্রতিপক্ষ বস্তু সমূহ এক অপরের দ্যোতক; কিন্তু আত্মার অবর্তমান অবস্থায় অনাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা গভীর সাধনাসাপেক্ষ। জড়-চেতন বিবিধ ধাতুকে বিশ্লেষণ করে মনোনিবেশ করতে না পারলে অনাত্ম লক্ষণ সহজে জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ হয় না। তথাপি লোকেরা মনে করে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার আধাররূপে আমাদের অভ্যন্তরে এক চির শাশ্বতঃ আত্মা বিরাজমান, যা জন্মের পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, মৃত্যুর পরেও নূতন দেহ ধারন করবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে মানসিক প্রক্রিয়া দেখি, যা একটির পর একটি অবিরাম গতিতে প্রবাহিত, যা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী, চেতনার এই অবিরাম প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বতঃ আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারেনা।

অভিজ্ঞতাবাদী **'হিউম'** এর মতে আত্মা বলে কোন অবিনশ্বর সত্তা নাই, কতকগুলি অবিচ্ছিন্ন অনুভূতি বা মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টিই আত্মা। অন্ত র্দর্শনে আমরা কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল আত্ম-সংবেদনের দেখা পেয়ে থাকি; কোন শাশ্বতঃ আত্মার সন্ধান পাইনা। দার্শনিক **'উইলিয়ম জেম'** এর মতে, **'চৈতন্যের অবিচ্ছিন্নধারা প্রবাহই আত্মা, এতদ্ব্যতীত জ্ঞাতা, ভোক্তারূপে কোন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব নাই।**

প্রোঃ টিসোনার চিরস্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন না। সুতরাং দেখা যায়, বুদ্ধের অনাত্মবাদ সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ বুদ্ধের অনাত্মবাদ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইখানে দুইটি জিজ্ঞাসা স্বতঃই মানব মনকে উদ্বেলিত করে তোলে- প্রথমত: আত্মা যদি কোন শাশ্বতঃ সত্তা না হয়ে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা- প্রবাহ হয়, তা হলে ব্যক্তি অভিন্নতাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? শৈশব, কৈশোর ও বার্ধক্য যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার ধারা বাহিকতার মধ্যে যে এক অভিন্ন ব্যক্তি বিরাজমান, তা কি করে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে? দ্বিতীয়তঃ যদি কোন চিরশাশ্বতঃ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয়, তা হলে জন্মান্তরবাদকে কিভাবে স্বীকার করা চলে? বৌদ্ধেরা কর্মবাদী, কর্মফল ভোগের জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ বৌদ্ধধর্মের মূল সিদ্ধান্ত; সুতরাং জীবকে কর্মফল ভোগ করতে হলে কোনও শাশ্বতঃ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। যে ব্যক্তি কর্ম করেছে, তার যদি কোন প্রকার অস্তিত্বই

না থাকে, কর্মফল ভোগ করবে কে? এক ব্যক্তি কর্ম করেছে, অন্যে তার ফল ভোগ করবে কেন?

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরা প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, জীবের মধ্যে কোন শাশ্বতঃ সত্তার অস্তিত্ব নাই, তবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রতিটি পূর্ববর্তী অবস্থা পরবর্তী অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে; সুতরাং জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে একটা কার্য–কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মিলিন্দ প্রশ্নে একটা সুন্দর দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন একটি প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলছে, যদিও প্রতিটি মূহুর্তেই আমরা প্রদীপের একটি মাত্র শিখাই দেখছি; কিন্তু পূর্ব পূর্ব মূহুর্তের শিখা পর পর মূহুর্তের শিখা এক নয়, অথচ প্রতি মূহুর্তেই প্রদীপের সলিতার ও তৈলের ভিন্ন অংশ জ্বলছে, তবুও আমরা একটি মাত্র প্রদীপের শিখাই দেখছি। আরও দেখা যাক্ একটি প্রদীপ হতে আর একটি প্রদীপ জ্বালান হল, এভাবে বহু প্রদীপ জ্বালিয়ে একটির পর একটি সরল রেখায় স্থাপিত করলে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মনে হবে একটি অখন্ড প্রদীপের রেখা। আর সেই প্রদীপ রেখার অন্তরালে নিরবচ্ছিন্ন ও একত্ব আমাদের দেখার ভূল। অনুরূপভাবে আমাদের জীবন প্রদীপের প্রতিটি মূহুর্ত ভিন্ন হলেও সারাটা জীবনের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জন্মান্তর গ্রহণ অর্থে গীতোক্ত কোন চিরশাশ্বতঃ আত্মার পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নূতন দেহ ধারণ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন হতে পরবর্তী জীবনের উদ্‌ভব। এখানে জীবন হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ, যা নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হতেছে এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে। এভাবে জন্ম হতে জন্মান্তরে ধারাবাহিকতার স্রোত বহে চলেছে, একটার পর একটা, পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, এখানে কোন চিরশাশ্বতঃ আত্মা টিকে থাকতে পারে না। কারণ ভৌতিক ও মানসিক সব কিছুই গতিশীল, প্রবাহরূপ, ক্ষণিক, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপ। ধর্মপদে তাই বলা হয়েছে –**'সমস্ত সংস্কার অনিত্য, সমস্ত সংস্কার দুঃখ এবং সমস্ত ধর্ম অনাত্ম'** এ হল প্রকৃতির ধর্ম, পরিবর্তন যখন প্রকৃতির ধর্ম, তখন এমন কিছু থাকতে পারে না, যা পরিবর্তনশীল নহে। একটা নিরুদ্ধ হয়, একটা উৎপন্ন হয়, যা নিরুদ্ধ হয়, ঠিক তা উৎপন্ন হয় না, নিরুধ্যমান বস্তুর ধর্মপ্রবাহ উৎপদ্যমান বস্তুতে সম্মিলিত হয়। এই জন্য চরম বিজ্ঞানে গৃহীত হয় যে, পরজন্মে যে উৎপন্ন হয়, সে সেও নয় অন্যও নয়। **'ন চ সো ন সো অঞ্ঞো।'**

অদ্যকার আমি অতীতের কর্ম ও জ্ঞান সমষ্টির ফল মাত্র, আর বর্তমান আমি ভবিষ্যতের হেতু; এই হেতু-ফল পরম্পরা জলতরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে; সুতরাং তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গে যে সমৃদ্ধ এজন্মের সঙ্গে পরজন্মের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। গত কল্যের **'আমি'** ও অদ্যকার **'আমি'** এক হলেও যেমন পুরোপুরি এক নহে, তেমন এজন্মের **'আত্মা'** বা **'আমি'** পরজন্মের **'আত্মা'** বা **'আমি'**ও এক নহে, একত্বের ভান হতেছে মাত্র। ডক্টর রাধা-কৃষ্ণণ ঠিকই বলেছেন-**'বিচার সমূহের রাজ্যে জীবনের অর্থই পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই বৌদ্ধ চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করেছে।'** সুতরাং বস্তুর স্থিতিশীলতায় এক অবস্থা উৎপন্নের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বাবস্থার নিরোধ হয়ে যায়; কিন্তু প্রবাহ চলতেই থাকে, মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না; জন্মান্তর গ্রহণ ব্যাপারেও একই অবস্থা, এক জন্মের অমি বিজ্ঞানের নিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্জন্মের প্রথম বিজ্ঞানের উদয় হয়। এভাবে প্রতিক্ষণ পরিবর্তন হচ্ছে, কাজেই একত্ব জগতে অলভ্য বস্তু।

বৌদ্ধেরা আত্মাকে বস্তুসদরূপে স্বীকার করেন না, এমন কি আত্মা নামধ্যেয় কোন পদার্থই বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত নহে। অবশ্য যে আত্মা অন্যবাদীদের নিকট বস্তু সদরূপে ইষ্ট, বৌদ্ধদের কাছে তা স্কন্ধ সন্ততির জন্য প্রজ্ঞপ্তিসদ্ মাত্র। যেমন **'রথ'** নামক কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই, ঈশা, চক্র, নেমি প্রভৃতি অঙ্গ সম্ভাবের সমবায়ে **'রথ'** শব্দের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ **'আত্মা'** নামক কোন শাশ্বতঃ সত্ত্বা নাই, পঞ্চস্কন্ধের সমবায়েই সত্ত্বনামের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক ভৌতিক ও মানসিক উপাদানের সমষ্টিই প্রাণী বা জীব নামে পরিভাষিত হয়। এতদ্ব্যতীত আত্মা, সত্ত্বা, জীব বলে কোন অপরিণামী শাশ্বতঃ সত্ত্বা নাই। যাঁরা শাশ্বতঃ আত্মার কথা বলেন তাঁরা হয়ত পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে অথবা যে কোন একটি স্কন্ধকে আত্মা বলে থাকেন। আসলে শাশ্বতঃ আত্মার কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই; শুধু কল্পনা মাত্র, বিপর্যয় মাত্র। এইরূপে বিপর্যয়ের দরুনই অনাত্মধর্ম সমূহে আত্মধর্ম কল্পনা করা হয় এবং আত্মগ্রহ হয়। এইরূপ আত্মগ্রহকে ঘোর মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়েছে এবং এর পরিভাষা দে'য়া হয়েছে- সৎকায়দৃষ্টি, আত্মবাদোপাদান, মানসংযোজন ইত্যাদি।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান, এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বা সংহতিই জীবন। এরা অনাত্ম, এরা যদি আত্মা হত, তবে আমাদের কারণ হত না। আমার "রূপ"এইরূপ হউক, এইরূপ হউক; রূপে এই আধিপত্য চলত।

বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞান...পূর্ববৎ। যেহেতু পঞ্চস্কন্ধ অনাত্ম, সেহেতু তৎপ্রতি আমাদের আধিপত্য অচল। এই পঞ্চস্কন্ধের যে কোন একটিকে আত্মা কল্পনা করা, তৎপ্রতি তৃষ্ণা–দৃষ্টি মান–বশে অভিনিবেশই সদ্‌কায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি। জীবের জড়– চেতন যে কোন অংশকে অজর, অমর, চিরশাশ্বতঃ বলে বিশ্বাস করা, তৎপ্রতি বদ্ধমূল ধারণাই আত্মবাদোপাদান। আত্ম বিষয়ক মানকেই আত্মমান বলা হয়, অস্মিমানই এর অর্থ। এই পঞ্চস্কন্ধ যদি আত্মাই হয়, তাহলেও তা নিত্য হতে পারে না। তাই নাগার্জুন বলেছেন,–

'আত্মা স্কন্ধা যদি ভবেদুদয়ব্যয়ভাগ্‌ ভবেৎ,
স্কন্ধেভ্যো'ন্যো যদি ভবেদ্‌ভবেদস্কন্ধলক্ষণঃ।'

আত্মা যদি রূপাদি স্কন্ধের অন্তর্গত হয়, তবে তা উদয়ব্যয়ধর্মী হবে আর যদি স্কন্ধ হতে অন্য কিছু হয়, তবে তা অস্কন্ধ লক্ষণ অবিদ্যমান; সুতরাং উহা আকাশ কুসুমবৎ অসৎ। আত্মবাদীরা আত্মার যে স্কন্ধাতিরিক্ত লক্ষণ, বস্তুতঃ তাঁরা আত্মাকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করে তার লক্ষণ করেন না। তাঁরা বলে থাকেন, আত্মা স্বরূপতঃ উপলব্ধির বিষয় নহে,–'অবাঙ্‌ –মনস– গোচর।' আত্মা যদি থাকেন, 'অবাঙ্‌ –মনস– গোচর' হয়, তবে উপনিষদের ঋষিরা উপনিষদে আত্মার আকার পরিমান, অবস্থাদি সম্বন্ধে অণু, সরিষা, ব্রীহি, যব, অঙ্গুষ্ট, বিতস্তি ও দেহ পরিমান রূপে নানা মুনির নানা পরিকল্পনা কেন? এইরূপ আত্মা, পরিকল্পনাকে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ঘোর মিথ্যাদৃষ্টি বলেছেন। শুধু বৌদ্ধ দার্শনিকেরা কেন বেদান্তকেশরী শংকরের গুরুর গুরু (দাদা) গৌড়পাদাচার্য ও মান্ডুক্য করিকাতে স্পষ্ট ভাষায় আত্মার কাল্পনিকত্ব স্বীকার করেছেন ঃ –

'অনিশ্চিতা যথা রজ্জু' ন্ধকারে বিকল্পিতা,
সর্প ধারাদিভিভাবৈ 'স্তদড়্গাদাত্মা।'

অন্ধকারে যেমন রজ্জুর নিশ্চিত জ্ঞান না হওয়াতে সর্প তথা জলধারা প্রভৃতির বিকল্প উৎপন্ন হয়, ঠিক আত্মা কল্পনাও তদ্রূপ। রজ্জুর জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সর্পরূপ বিকল্প নষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ নিশ্চিত জ্ঞান হলে 'আত্মা' এই বিকল্পও নষ্ট হয়ে যায়।

জীবজগতের জড়–চেতন এই দুই ধারাপ্রবাহের মধ্যে নিত্য, নির্বিকার, চিরশাশ্বতঃ কোন পদার্থই অদ্যাবধি কোন জীববিজ্ঞানীর প্রয়োগ শালায় আবিস্কৃত হয় নাই। যাকে আমরা আত্মা বলে মনে করি, যা জন্ম নিতেছে, মরতেছে, তা এক সন্ততি বিশেষ, যার অঙ্গ সমূহের মধ্যে হেতুফল সম্বন্ধ

বিদ্যমান এই সন্ততি পরম্পরার সিদ্ধান্তই বৌদ্ধ চিন্তাধারার এক মহান বৈশিষ্ট্য। এই সন্ততি পরম্পরা এমন এক স্বতন্ত্র সত্তা যা স্বীয় কর্ম এবং ইচ্ছা সমূহের বশেই প্রবাহিত হয়। এই ভাবে বৌদ্ধেরা ধর্মসমূহের সন্তান স্বীকার করেন, কিন্তু সন্তানি (ধর্মি) কে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন শরীরকে আত্মা মনে করা যেমন মূঢ়তা,তদ্রূপ শরীর হতে ভিন্ন নিত্য আত্মা স্বীকার করাও মূঢ়তা। তাঁরা কর্ম ও তৎফলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু কারকের তথা বেধকের প্রতিষেধ করেন। তাঁদের মতে বিশুদ্ধ ধর্ম সন্ততিই প্রবর্তিত হতেছে এটাই সম্যক দর্শন। কোনও স্কন্ধ–বিশেষ ভব হতে ভবান্তরে সংক্রমন করে না; পরন্তু প্রতিক্ষণ প্রবাহ চলতেই থাকে,যেমন জলধারা, প্রদীপ প্রভা ইত্যাদি।

আত্মবাদের একটি প্রধান যুক্তি প্রত্যভিজ্ঞা। 'আমি ছিলাম, সেই আমিই এই, যেই আমি দেখে ছিলাম, সেই আমিই শুনতেছি।' এইরূপ স্বীকৃতি ও একত্বের অনুভূতিই প্রত্যভিজ্ঞা। কুমারীলভট্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণরূপে উপস্থিত করেছেন, যা পরিকল্পিত, ভ্রান্তিকারক এবং স্বপ্নবৎ অলীক। স্বপ্নে যেমন কেহ রাজ রাজেশ্বর হয়ে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন আর কেহ পুত্রের মৃত্যু দেখে বিলাপ করেন, জাগ্রত হলে রাজত্ব ও পুত্রের মৃত্যু সবই ভ্রমাত্মক ছিল, কিন্তু বুঝতে না পেরেই হাসি কান্নার অনুভূতি। স্বপ্নের অনুভূতি যেমন জাগ্রতাবস্থায় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। বাসনাজালে আবদ্ধ জীবের প্রত্যভিজ্ঞাও মুক্তাবস্থায় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়, মুক্তাবস্থায় আমি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বা বিতস্তি পরিমাণে আছি বা ছিলাম, এই যে ভ্রান্ত ধারণা তখনই বুঝা যাবে যখনই বাসনাজাল ছিন্ন করে মুক্ত হবে। এই বাসনাজাল অতিভয়ঙ্কর। এই বাসনাজালই আত্মা–আত্মীয় ভাবের কারণ, আত্মা–আত্মীয় ভাবই সমস্ত দুঃখের মূল। যত দিন মানব মন হতে এই ভ্রান্ত ধারণার বিলোপ হবে না, তত দিন প্রকৃত দুঃখ মুক্তি অসম্ভব। দুঃখ মুক্তির ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে অনাত্মবাদ প্রধান অবলম্বন। আত্মা–আত্মীয়ভাব শান্ত হলে অহংকার, মমকার দুরীভূত হয়, তখন সদ্‌কায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ ও আত্মবাদোপাদান; এই চতুর্বিধ উপাদান নিরোধ হয়। উপাদান নিরোধে জন্ম–নিরোধ, জন্ম নিরোধে কর্মক্লেশ নিরোধ হেতু মুক্তিরূপ অভিনশ্বর আনন্দরূপ নির্বাণ লাভ হয়।

'নিব্বানং পরমং সুখং'

সন্তোষই পরম ধন

(সংতুট্‌ঠী পরমং ধনম্)

মূল হিন্দী ঃ উপাসিকা আর. তুলী, দিল্লী;
বঙ্গানুবাদ ঃ বিমান বিহারী চাকমা, খাগড়াছড়ি।

ধম্মপদ–এ ভগবান বুদ্ধ বলেছেন– আরোগ্যের চেয়ে বড় লাভ নেই। সন্তুষ্টির চেয়ে বড় ধন নেই।

যে ব্যক্তির কাছে সন্তোষ–ধন আছে, সন্তুষ্টি আছে সে সুখী, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট যা থাকে তা নিয়ে জীবন কাটান, আনন্দিত হওয়া। তাতে সুখ উপভোগ করা। সন্তোষী জীবন যাপন করাও একটি কলা। নিজের কাছে যা আছে কিংবা নিজের যা সামর্থ্য রয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, সুখ অনুভব করা। সুখ উপভোগ করাও একটি কলা। সন্তুষ্ট থাকার অভিপ্রায় হ'ল আমাদের যা রয়েছে তাতে এতটা সুখ গ্রহণ করা যাতে পরের প্রতি আসক্তি না থাকে।

নিঃসন্দেহে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন– সন্তুষ্টির চেয়ে বড় ধন নেই, সন্তুষ্টির চেয়ে সুখ নেই কিন্তু সঙ্গে তিনি এটি কখনো বলেননি যে দরিদ্র হলে দরিদ্র থেকে যাও এবং নিজের দৈন্যতার কাছে মাথা নত কর ও নিজেকে সমর্থ বানানোর প্রয়াস করো না বা পরিশ্রম করো না। না! আত্ম সম্মানের সাথে বাঁচতে হবে। যেখানে ভগবান সন্তুষ্টির মহিমার কথা বলেছেন সেখানে ঐশ্বর্যেরও স্বাগতঃ জানিয়েছেন। দয়ার পাত্র হয়ে থাকা, দরিদ্র অবস্থায় থাকা হ'ল প্রমাদের মধ্যে থাকা। অলস জীবন যাপন করা।

সুদত্ত নামে এক নাগরিক, কোসল–জনপদের রাজধানী শ্রাবস্তীতে বাস করত। সুদত্ত রাজা প্রসেনজিতের শ্রেষ্ঠী (খাজাঞ্চী) ছিল। সে দীন–দরিদ্রের ওপর দয়াবান ও বড় দাতা ছিল। গরীবদের প্রচুর দান করত, তাই তার নাম হয়ে গেল অনাথপিন্ডক।

সে সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। সুদত্ত কোনোকাজে রাজগৃহে গেল। সেখানে সে দেখল যে তার শালা শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুসংঘ ও ভগবান বুদ্ধকে ভোজন করানোর জন্য বড় ধরনের আয়োজন করছে। সে ভেবেছিল যে কোনো বিয়ের আয়োজন কিংবা রাজাকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে।

যখন জানল যে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং তাঁকে স্বাগতঃ জানাতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তখন সুদত্ত ভগবান বুদ্ধের দর্শন করতে উৎসুখ হয়ে ওঠলো এবং সেখানে গেল যেখানে ভগবান বসেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ নির্মল হৃদয় অনাথপিন্ডককে মধুর বচনে স্বাগতঃ জানালেন।

অনাথপিন্ডক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল যে ভগবান! আমার শংকা নিবারণ করুন এবং আমার কর্তব্যের আদেশ করুন।

ভগবান বললেন–অনাথপিন্ডক! তোমার শঙকা কি বলো।

এতে অনাথপিন্ডক বলল–ভগবান! আমার অনেক কাজ। আমি অনেক ধন সংগ্রহ করেছি এবং কিছু কাজের চিন্তা আছে। তা সত্ত্বেও আমি প্রসন্নতাপূর্বক স্বীয় কর্তব্য বুঝে আপন কাজে মনোযোগ দিয়ে লেগে থাকি। আমার চাকর-বাকর, তাদের জীবিকা প্রভৃতি আমার ব্যবসার সফলতার ওপর নির্ভরশীল।

আমি শুনেছি যে আপনার শিষ্যগণ প্রবজ্যা–সুখের গুণগান ও গৃহস্থ জীবনের নিন্দা করে থাকেন এবং বলেন তথাগত স্বীয় রাজ্য, ঐশ্বর্য ত্যাগপূর্বক সদ্ধর্মের পথ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন এবং সারা সংসারকে জনকল্যাণের, নির্বাণের পথ দেখিয়েছেন।

ভগবান! যা উচিত তাই আমি করতে চাই। আমার উৎকট অভিলাষ হল যে আমি যেন আমার বন্ধু–বান্ধবদের সেবা করতে পারি। অনুগ্রহপূর্বক আমায় বলুন আমার জন্য কি করা উচিত। আমি কি স্বীয় সম্পত্তি, ঘর, ব্যবসা সব ত্যাগ করবো এবং আপনার মত সদ্ধর্ম জীবনের সুখ লাভের জন্য গৃহত্যাগ করতঃ প্রবর্জিত হবো? অনুগ্রহপূর্বক আমায় পথ প্রদর্শন করুন।

তথাগত উত্তরে বললেন–অনাথপিন্ডক! ধর্ম–জীবনের সুখ সেই প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাপ্য যে বা যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নিয়মাবলী নিজের

আচরণে গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ধনের প্রতি আসক্ত, ধনের সদ্ব্যবহার জানে না এবং ধনের আসক্তিতে নিজের মনকে বিষাক্ত করে তোলে তার জন্য ধন ত্যাগ করা ভাল। যার মনে ধনের লিপ্সা নেই ও ধনের সদ্ব্যবহার করে সেরূপ ব্যক্তি নিজের বন্ধু– বান্ধবদের বরদান স্বরূপ। অতএব আমি তো তোমাকে এটিই বলবো যে নিরাসক্ত হয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাও আর গৃহস্থ থেকে যাও। আপন ব্যবসায় অপ্রমাদী হয়ে লেগে থাক। মানুষের জীবন, ঐশ্বর্য ও অধিকার তাকে দাস বানায় না বরং জীবন, ঐশ্বর্য ও অধিকারের প্রতি যার আসক্তি রয়েছে সেসব তাকে নিজেদের দাস বানিয়ে ফেলে। অতএব সদা জাগরুক থাক, সচেতন থাক ও সমৃদ্ধিতে জীবন কাটাও। পূর্বে ভগবান বলেছেন– মানুষ যা চায় করতে পারে। সে শিল্পী হতে পারে, দোকান –পাট করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে, সরকারী চাকুরী করতে পারে কিংবা সংসার ত্যাগ করে ধ্যান–ভাবনায় রত থাকতে পারে, তার আপন কার্য মনোযোগ দিয়ে আস্থার সহিত সম্পাদন করা উচিত। তার পরিশ্রমী ও উদ্যমী হওয়া উচিত। জীবন হল সংগ্রাম, সংগ্রামে ভীত হইও না। আর হ্যাঁ! জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থেকেও মনে ঈর্ষ্যা ও ঘৃণাকে স্থান দিও না। সংসারে স্বার্থপর হয়ে নয়, যারা পরমার্থভরা জীবন যাপন করে তারা সুখ, শান্তি ও আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়।

এভাবে তথাগত বললেন–নিরাসক্ত হয়ে সমৃদ্ধিতে জীবন কাটাও। তাতে সন্তুষ্টি আছে,আছে শান্তিও। শান্তির অর্থ হ'ল সন্তুষ্টি। আর যেখানে সন্তুষ্টি আছে সেখানে সমৃদ্ধিও আছে। এটি বলতে অসংগত মনে হয় কিন্তু সত্য। শান্তিময়, সুখী জীবন যাপনের জন্য বৈধ ও ন্যায্যভাবে অর্জিত ধন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করে। কোন প্রকার ভয় হয় না আর দারিদ্র্য দূর হয়। দারিদ্র্য দূর হলে আত্মসম্মানের ভাবনা বাড়ে। আত্মসম্মানে অহংকারের অহমিকা থাকে না। সত্যের মধ্যে অহংকারের মত্ততা থাকে না। মিথ্যার মধ্যে অহমিকা আসে।

বৈধভাবে অর্জিত ধন দিয়ে গৃহপতি সাধু শ্রমণদের দান দেয়। বিনম্র হয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তির মন শান্ত, সংযত ও সুখী হয়।

সেরূপ ব্যক্তি ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তির অসন্তোষ থাকে নিজের বিকাশের জন্য নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করার জন্য। সকলের প্রতি প্রেম ভাব বিকশিত করার জন্য। নিজের আচরণকে ভাল করার জন্য। এভাবে নিজের প্রয়াসে সেরূপ ব্যক্তি ধার্মিক হয়ে যায়।

অধার্মিক ব্যক্তি অপরকে ভাল অবস্থায় দেখে জ্বলতে থাকে, নিজেকে ঈর্ষ্যা দ্বেষে ভরে তোলে।

এক ধনী ব্যক্তি ছিল। তার অনেক ধন ছিল। সে তার ইচ্ছানুযায়ী ভাল জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী বানিয়েছে। সেগুলোকে সে সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত করেছে আর নিজের স্ত্রী–পুত্রকে নিয়ে বাস করতে লাগল। সে নিজের বাড়ীকে দেখে খুব প্রসন্ন হত এ ভেবে যে আমার বাড়ী সবচেয়ে সুন্দর, বড় ও ভব্য। তার যেসকল বন্ধু–বান্ধব আসে তাদেরকে বাড়ীটি দেখিয়ে সে প্রসন্ন হত। কিছু সময় পর তার এক বন্ধু তার কাছে আসল তখন সে খানিকটা উদাস ও নীরব হল। তখন তার বন্ধু জিজ্ঞেস করল–কি ভাই, আজ আমাকে তোমার ঘর দেখাবে না? তখন সে ধনী ব্যক্তিটি বলল–এখন ঘর কি দেখাব দেখছ না, আমার ঘরের সামনেই আমার ঘরের চেয়েও বড় ঘর এক অন্য ব্যক্তি বানিয়েছে? এখন সেব্যক্তি ক্লান্ত, আর তার ঈর্ষ্যা হচ্ছে যে আমার ঘরের চাইতেও বড় ঘর অপর সে ব্যক্তি কিভাবে বানালো। যে ব্যক্তির সন্তোষ রয়েছে বা সন্তোষী জীবন যাপন করে সে ব্যক্তি সাগরের মত গম্ভীর হয়। স্ফীত হয় না। তার মধ্যে ঈর্ষ্যা দ্বেষ থাকে না।

ভগবান বলেছেন-তৃষ্ণা ও লোভ হ'তে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। কোনো প্রকার ইচ্ছে হলে, তৃষ্ণা হলে ব্যক্তি লাভের পেছনে ছোটে। লাভের কামনা করলে কাম ও রাগ উৎপন্ন হয়। কাম ও রাগ উৎপন্ন হলে বস্তু সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি বাড়ে যা লালসার প্রতীক। বস্তু সংগ্রহ থেকে লালসার ভাব উৎপন্ন হয় এবং সংগৃহীত সম্পত্তির প্রতি রাগ আসক্তি উৎপন্ন হয় ও আসক্তি থেকে অকুশল ধর্মের উৎপত্তি হয় যথা লড়াই, ঝগড়া, কলহ প্রভৃতি।

যার ভিতর সন্তোষ জেগেছে তার মধ্যে তৃষ্ণা থাকে না আর যার মধ্যে তৃষ্ণা না থাকে যা দুঃখের মূল, সেব্যক্তিকে কেউ সুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। জাগ্রত অবস্থায় তৃষ্ণারূপী চোর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। যেব্যক্তি লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত তার কাছে যতই ধন আসুক, যত বড়ই চেয়ার, পদ, প্রতিষ্ঠা সে পেয়ে থাকুক; সেব্যক্তি কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না কেননা তার আরো বড় পদ, প্রতিষ্ঠা চাই। সেব্যক্তি ভূলে যায় যে এসকল বস্তু অল্প সময়ের জন্য প্রসন্নতা দেয় এবং ক্ষণিক। এভাবে

তৃষ্ণা বেড়েই চলে, লোভ বাড়তে থাকে এবং যেখানে লোভ থাকে, তৃষ্ণা থাকে সেখানে সন্তোষ–ধন স্থায়ী হয় না।

লোভ হতে আসক্তি সৃষ্টি হয় আর আসক্তি থেকে ভয় উৎপন্ন হয়, দুঃখ উৎপন্ন হয়। যেব্যক্তি লোভ হতে, আসক্তি হতে মুক্ত, তার না থাকে দুঃখ, না থাকে ভয়।

যে শীলবান, প্রজ্ঞাবান, সত্যবাদী, ন্যায়প্রিয় ও নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, সমাজে তেমন ব্যক্তির সম্মান থাকে ও সর্বাধিক কদর পায়। তেমন ব্যক্তি যেখানেই যাক সমাদর পায়।

সন্তোষ–ধন নিজের মধ্যে অর্জনের জন্য নিজের মধ্যে সন্তুষ্টির ফুল ফোটান, তার জন্য ধ্যানের অভ্যাস আবশ্যক। ধ্যানের অভ্যাসে মন শান্ত হয়, কোনো দুর্মনস্য থাকে না ও সুখ অনুভব হয়।

পরিশ্রম করে, বৈধভাবে, আস্থার সাথে ন্যায়তঃ ধন সমৃদ্ধি অর্জন করতঃ নিরাসক্ত হয়ে জীবন কাটান তাতে সন্তুষ্টি আছে, আছে শান্তিও। শান্তির অর্থ হল সন্তোষ আর যেখানে সন্তোষ আছে সেখানে আছে পরম আনন্দ।

'আরোগ্য পরম লাভ,
সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি,
নির্বাণ পরম সুখ।'

–ধম্মপদ।

নিব্বানং পরমং সুখং

– ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী

বুদ্ধ তথাগত দুঃখের কারণ বলেছেন–অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, কর্ম ইত্যাদি। প্রাণী মাত্রই এই সকল ভোগ–তৃষ্ণায় ব্যাকুলতাজনিত কর্ম প্রাণীদিগকে বার বার এক জন্ম হতে জন্মান্তরে নিয়ে যেতেছে। এই ভাবে জন্ম–মৃত্যুরস্রোতে প্রবাহমান প্রাণীকুলের পুর্বসীমা জানা যায় না।

এই অনন্ত জন্মান্তরীণ দুঃখ শৃঙ্খলা হতে মুক্তি পেতে হলে অবিদ্যা–তৃষ্ণারূপী কর্ম–বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। উহা সম্ভব হবে প্রজ্ঞার প্রকর্ষ দ্বারা, তজ্জন্য অনুশীলন করতে হবে নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা আর্য

অষ্টাঙ্গিক মার্গের। দশর্ন বিশুদ্ধির নিমিত্ত, এই মার্গই একমাত্র পথ; অন্য পথ নাই। **'এসবে মগ্‌গো নত্থঞ্‌ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিয়া'** এই মার্গ অবলম্বন করেই দুঃখের অন্তসাধন করতঃ পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা যায়। নির্বাণের চর্চা বৌদ্ধ ধর্ম–দর্শনের সকল পরম্পরাতে উপলব্ধ হয়। দান, শীল, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, সকল পূণ্যানুষ্ঠানের অন্তেও বলা হয় – **'নিব্বান পচ্চয়ো হোতু।'** অর্থাৎ নির্বাণ লাভের হেতু হউক। সেই নির্বাণ কি? **'নি'** উপসর্গের সঙ্গে **'বান'** শব্দের সমাসে নির্বাণ পদ সিদ্ধ হয়েছে। **'বান'** তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপরাপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবকে **'ভব'** হতে ভবান্তরে **'সিব্বন'** বা **'বন্ধন'** করায় বলে তৃষ্ণা **'বান'** নামে অভিহিত হয়। **'নি'** উপসর্গ তৃষ্ণার অভাব বা অতিক্রম অর্থ প্রকাশ করতেছে। অর্থাৎ যে ধর্ম সাক্ষাৎ করে তৃষ্ণা বন্ধন ছিন্ন হয়, রাগ, দ্বেষ, মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, তারই নাম নির্বাণ। অর্থাৎ সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিই নির্বাণ। নাগসেন বহু প্রকার যুক্তি দিয়ে রাজা মিলিন্দকে নির্বাণের স্বরূপ বলার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মানবীয় ভাষা দিয়ে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। নির্বাণ হল মানবীয় চিন্তার অতীত এক অনির্বচণীয় অবস্থা, অনুভবের বিষয়, ভাষা এখানে মূক, মারবীয় চিন্তাধারা এখানে সুব্যহত। তাই বুদ্ধ অনেক সময় নেতি বাচক শব্দ দ্বারা নির্বাণের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। যেন নির্বাণ সেই অবস্থা যেখানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, মনস্তাপ নাই, হতাশা নাই, এমনকি যেখানে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু নাই, চন্দ্র– সুর্য– গ্রহ– নক্ষত্রের সংস্থান নাই, অথচ অন্ধকারও নাই। যেখানে সংসার স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়েছে, নামরূপ

অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়েছে, গ্রন্থি খুলে গিয়েছে, বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, সেই পরমাবস্থাকেই নির্বাণ বলা হয়েছে।

নির্বাণ শাশ্বতানন্দের অবস্থা কিনা, জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের জাগতিক সুখ-দুঃখ বিষয়ানুরক্তির সঙ্গে জড়িত; সুতরাং তারই আলোকে নির্বাণের ব্যাখ্যা করা চলে না; কারণ নির্বাণ এক অচিন্তনীয় অবস্থা, অবর্ণনীয় বিষয়, একে ব্যাখ্যা করা আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতায় সম্ভব নয়। এই অবস্থা মানবীয় বুদ্ধির অতীত, মানবীয় ভাষায় এর ব্যাখ্যা চলে না। তাই ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত মহাশয় বলেছেন, **'জাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা আমার কাছে নিরর্থক কাজ বলেই মনে হয় এ হল সকল রকম দুঃখ থেকে বিরত, এ ছাড়া আর অন্যভাবে এর থেকে ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যে অবস্থায় সকল রকম জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাকে 'ভাবাত্মক' কোন ভাবে বর্ণনা করা চলে না।'** সুতরাং নির্বাণকে এই ভাবাভাব বিনিমুক্ত নিষ্প্রপঞ্চ বলা হয়েছে।

প্রপঞ্চ বলা হয়, দেশকালের সীমানাবদ্ধ জীবজগতকে, কিন্তু নির্বাণ এই সব প্রপঞ্চের অতীত। নির্বাণকে অনিদর্শন বলা হয়েছে, কারণ কোন প্রকার নিদর্শন দ্বারা নির্বাণকে বর্ণনা করা যায় না, বা নির্দেশ করা যায় না। তাই নির্বাণ অনিদর্শন। এর অপর নাম অনিমিত্ত, নিমিত্ত অর্থে চিহ্ন বা লক্ষণ, নির্বাণ চিহ্ন বা লক্ষণ বর্জিত তাই অনিমিত্ত। নির্বাণকে অচ্যুত বলা হয়েছে, **'নিব্বানং পদমচ্চু তং।'** কোন কোন স্থানে নির্বাণকে অনুত্তর যোগক্ষেমও বলা হয়েছে– **'যোগক্খেমং অনুত্তরং।'** সুতরাং নির্বাণ দেশ–কালের অতীত, ব্যবহারিক সত্তার কোন গুণ নির্বাণে আরোপ করা যায় না। তদ্ধেতু নির্বাণ একান্ত শূন্য নহে; তাহলে দুংখময়। সংসারের নিঃসরণ বা অবসান কখনও হত না। জ্ঞানীরা বলেন–**'নিবৃত্তি চিরকাল আছে , কিন্তু নিবৃত্ত কোন পুরুষ নাই।'** এই নির্বাণের শুণ্যতা।

ত্রিপিটকের অনেক স্থানে ভবনিরোধকেই নির্বাণ বলা হয়েছে। **'ভবনিরোধো নিব্বানং।'** ভব অর্থ জন্ম, সুতরাং জন্ম নিরোধই নির্বাণ। নির্বানং ভগবা আহ্ সব্ব ব্বগস্নহুপ্পমোচনং।' সমস্ত গ্রন্থির বিমোচনকেই ভগবান নির্বাণ বলেছেন।অর্থাৎ সর্বসংস্কারের উপশম, সর্বোপধির নিরসন, সংসারাবর্তের নিবৃত্তি, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, মুক্তি, অনালয়; এই নির্বাণ। যতক্ষণ তৃষ্ণাসক্তি, ততক্ষণ সংসার বন্ধন। **তাই**

তৃষ্ণাক্ষয়কেই নির্বাণ বলা হয়েছে। **'তণ্হায় বিপ্পহানেন নিব্বানমিতি বুচ্চতি।'** তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ। নির্বাণ সংসার অবস্থার নির্বাণ, ব্যবহারিক সম্ভার নির্বাণ, উপাধির নির্বাণ, অর্থাৎ নিরুপাধির অবস্থা প্রাপ্তি। একেই শাস্ত্রে দুঃখের নিরোধ বলা হয়েছে, কারণ দুঃখের নিরোধই নির্বাণ। **'নিরোধ নাম নিব্বানং।'** আরও বলা হয়েছে,– **'সংসার অনিত্য হেতু মিথ্যা; কিন্তু নির্বাণ নিত্য ও সত্য।' 'তহিং মুসা বং অমোসধম্মং তংসচ্চং বং অমোসধম্মং নিব্বানং।'** অর্থাৎ যা নশ্বর তা মিথ্যা, অনশ্বর নিবাণই সত্য। এই বাক্যই দর্শন শিরোমণি নাগার্জুন তথা চন্দ্রকীতি স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। **'তম্মৃষা মোষধর্মষদ্ ভগবা নিত্য ভাষত। সর্বেমোষধর্মমানঃ সংস্কারাস্তেন তে মুষাঃ।' 'এতদ্বি খলু ভিক্ষবঃ পরমং সত্যং যদিদং মোষমূর্ম নির্বানম্।' সর্ব সংস্কারাশ্চ মুষা মোষধর্মমানঃ ইতি।'** হে ভিক্ষুগণ, এই অবিনাশী নির্বাণই পরম সত্য, সমস্ত সংস্কার বিনাশী এবং মিথ্যা। সংকরাচার্যও নির্বিকারতাকে পরম সত্য বলেছেন।' সুতরাং নিবাণই পরম সত্য, অনন্যথাভাবী, অচ্যুত, অমৃত, অচিন্ত্য, অপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ প্রপঞ্চের উপশম। অতএব নির্বাণে আশ্রয় এষণা, রাগ, দ্বেষ, মোহ, সংযোজন, তৃষ্ণা, কর্ম ভব, নামরূপ, সংস্কার উপাধি প্রভৃতির নিঃশেষরূপে নিরোধ হয়, সংসার চক্রের গতি রুদ্ধ হয়, চলার আর শেষ থাকে নাঃ–**'নত্থি উত্তরি করণীয়ম্।'**

নির্বাণকে দুঃখতপ্ত হৃদয় জ্ঞানে শান্তির নিলয় বলে, অন্ধভক্ত মনে করে তার লক্ষ্যস্থল,তার্কিকেরা বলে থাকেন শূণ্যতা, জ্ঞানাভিমানী মনে করেন অস্তিত্বের বিলোপ; এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর লোকেরা নির্বাণকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করেছেন। এই জন্য অনেকের কাছে নির্বাণ ভীতিপদ হয়ে উঠেছে,বস্তুতঃ যুক্তিতর্কের অতীত, উপলদ্ধিগম্য। একে উপলদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রথমে চারিত্রিক পবিত্রতা, চিত্তের উৎকর্ষ এবং প্রজ্ঞান। কায়্–বাক্–মন সংযমে চারিত্রিক পবিত্রতা আসে, শুদ্ধচিত্ত বা শীলবান ব্যক্তিই সাধনার দ্বারা চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন। তাই বলা হয়েছে –

'সীলে পতিট্ঠায় সরোচ পঞ্ঞঞং,
চিত্তং পঞ্ঞঞঞঞঞ্চ ভাবয়েৎ
আতপী নিপকো ভিক্খু সো ইমং
বিজটয়ে জটন্তি।'

দৃঢ়বীর্য প্রজ্ঞাবান (ভিক্ষু) ব্যক্তিই শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্ত এবং প্রজ্ঞাভাবনা করতঃ এই জটারূপী সংসার হতে (বিজটিত) মুক্ত হতে সমর্থ হন।

তখন লোভ, দ্বেষ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, প্রভৃতি রিপুনিচয় চিত্ত হতে চিরতরে বিদূরীত হয়, চিত্ত হয় প্রসন্ন ও প্রভাস্বর। এতাদৃশ চিত্তেই প্রজ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। তারই শুভ্র আলোকে নির্বাণ উপলব্ধি হয়। এই তিন পরস্পর আপেক্ষিক। চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত না হলে চিত্তের উৎকর্ষ লাভের সাধনা পূর্ণ হয় না। সাধনার অভাবে প্রজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। প্রজ্ঞাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন মন নির্বাণের সন্ধান পায় না। অতএব নির্বাণের উপলব্ধির জন্য চারিত্রিক পবিত্রতা, চিত্তের উৎকর্ষ এবং প্রজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার প্রকর্ষ ব্যতীত নির্বাণোপলব্ধি সম্ভব নহে। এই নির্বাণোপলব্ধিরও স্তরভেদ আছে, যথা– স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ।স্রোতাপত্তি নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তর, এই স্তরে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌কায় দৃষ্টি (আত্মদৃষ্টি) সংশয় এবং শীলব্রতপরামর্শ চিরতরে বিদূরীত হয়। এতাদৃশ ব্যক্তির আর পতনের ভয় থাকে না। তাঁর নির্বাণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। সকৃদাগামীর কাম–ক্রোধ শিথিল হয়ে পড়ে, অনাগামীর কাম–ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে নির্মুল হয়ে যায়। অর্হত্বে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই অবশিষ্ট বন্ধন (সংযোজন) অহংভাব, ভবাসক্তি এবং অবিদ্যা নিঃশেষে ধবংস হয়ে যায়। তখনই তিনি হন সর্ব বন্ধনমুক্ত শুদ্ধ মুক্ত অনঙ্গন।

নির্বাণ কারণ সম্ভূত নহে, তাই নির্বাণের উৎপত্তি নাই, অনুৎপন্নের বিনাশ কোথায়? সুতরাং নির্বাণ উৎপত্তি বিনাশ রহিত চির শাশ্বতঃ। ভগবান অনেক প্রকারেই নির্বাণ লাভের পথ নির্দেশ করেছেন; কিন্তু নির্বাণোৎপত্তির হেতু বলেন নাই। সমাধি দ্বারাও নির্বাণ উৎপন্ন হয় না, মুক্তিকামী সাধক নির্বাণকে প্রাপ্ত করেন মাত্র। যেহেতু নির্বাণের উৎপত্তি নাই, সেই হেতু এর বিনাশও নাই। যেহেতু নির্বাণ উৎপত্তি রহিত, সেই হেতু নির্বাণ অজাত, অটুট, অকৃত এবং অসংস্কৃত। সুতরাং নির্বাণকে একটি ভাবাত্মক পদার্থ অথবা অভাবাত্মক পদার্থ বলা চলে না, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা একে উপলব্ধি করা যায় মাত্র। নাগসেন মিলিন্দকে নির্বাণের স্বরূপ বুঝাতে গিয়ে কখনও সমুদ্র, কখনও বা পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এগুলি উপমা মাত্র,

এ দ্বারা নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। নির্বাণ ভাবাভাব বিনির্মুক্ত এক অনির্বচনীয় অবস্থা বিশেষ, যা বর্ণনা করা যায় না; কারণ নির্বাণ অবিনশ্বর, সদাকালিক তথা কালাতীত। তাই নির্বাণ ধ্রুব, ধ্রুব বলে শুভ; ধ্রুব ও শুভ বস্তু একান্তই সুখময়। তাই বলা হয়েছে **'নিব্বানং পরমং সুখং।'** সেই সুখ ও দ্বিবিধ– অনুভবনীয় সুখ ও উপশম সুখ। অনুভবনীয় সুখ ক্ষণিক, উপশম সুখ অনন্তকালিক। কাম্যবস্তু স্পর্শ জনিত সুখ অনুভবনীয়, এর পশ্চাতে দুঃখের সংঘাত অপরিহার্য। এমনকি সোপাদিশেষ অবস্থায় নিরোধ সমাপত্তিতে নির্বাণ অনুভবনীয়, অনুপাদিশেষ অবস্থাই উপশম সুখ। সুতরাং একই নির্বাণ নির্বাপিতের অবস্থা ও পর্যায়ক্রমে সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ ভেদে দ্বিবিধ। বুদ্ধ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সোপাদিশেষ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। যাকে জীবন্মুক্তির অবস্থা বলা হয়। তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম প্রচার করে অশীতি বৎসর বয়সে কুশীনারার মল্লদের শালবনে যে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন, তাই অনুপাদিশেষ নির্বাণ। নাগার্জুন এর স্বরূপ বলেছেন ঃ–

'অপ্রহীনমসংপ্রাপ্তমনুচ্ছিন্নমশাশ্বতম,
অনিরুদ্ধমনুৎপল্লমেতন্নির্বাণ মুচ্যতে।'

চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্ত সন্ততির যে অবস্থা হয়, তা প্রতীতির অতীত; কোন প্রকারে লভ্য নহে। কোন শাশ্বতঃ পদার্থের উচ্ছেদও নহে, অথবা ভঙ্গুর অবস্থার শাশ্বতঃভাব প্রাপ্তিও নহে। এর বিনাশ নাই, যেহেতু এ উৎপন্ন নহে। এই সব লক্ষণ যুক্ত অবস্থাকেই অনুপাদিশেষ নির্বাণ বলা হয়েছে। একে বুঝাবার জন্য নাগার্জুন আদি পরবর্তী দার্শনিক আচার্যগণ অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন;যেমন-প্রদীপ্ত দীপশিখা বায়ুবেগে নিভে যায়,তখন উহার পরিমাণ করবার মত কোন প্রকার অস্তিত্ব অবশেষ থাকে না; তদ্রূপ অস্তগত জীবন্মুক্তের পরিমাণ করবারও কোন উপায় থাকে না। যেই নাম, গোত্র, দোষ, গুণ দ্বারা তাঁকে অভিহিত করা যায়, সেই সকল তাঁর আর বিদ্যমান থাকে না। তাই বলা হয়েছে ঃ–

বিঞ্ঞানস্স নিরোধেন তণ্হাক্খয় বিমুক্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খহোতিচেতসো।'

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের নির্বাণের ন্যায় তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নির্বাণের ন্যায় চিত্ত সন্ততির বিমোক্ষ হয়। একে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে ঃ-**'নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো।'** (রতন সুত্ত) প্রদীপ নির্বাণের ন্যায় পন্ডিতগণ নির্বাপিত হন। সেই নির্বাপিত অবস্থা বুঝাতে গিয়ে অশ্বঘোষ বুদ্ধ-চরিতে বলেছেনঃ-

'দীপোযথা নিবৃত্তিমভ্যুপেতো নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্, দিশাং ন কাঞ্চিৎ বিদিশাং ন কাঞ্চিৎ স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম।' 'তথা কৃতীনিবৃত্তি মভ্যুপেতো নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্, দিশাং ন কাঞ্চিৎ বিদিশাং ন কাঞ্চিৎ স্নেহ ক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।'

প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখা মাটিতে প্রবেশ করে না, আকাশেও গমন করে না, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোন দিকেও যায় না, কেবল স্নেহ পদার্থের ক্ষয় হেতু যেখানে দীপ জ্বলেছিল, সেখানেই শান্ত হয়ে যায়। সেইরূপ নির্বাপিত কৃতী পুরুষও অবনীতে প্রবেশ করেন না, আকাশেও গমন করেন না, কোন দিক দেশেও যান না; কেবল কলুষরাশির ক্ষয় হেতু যেখানে তাঁর জীবন প্রবাহ চলেছিল, সেখানেই তিনি চিরতরে নির্বাপিত হন।

এখানে নির্বাপিতের অর্থ অপুনরাবৃত্তি। এই যে নির্বাপিত বা নির্বাণ কেবল বিনাশই সুচীত করেনা, বস্তুতঃ জন্ম-জরা -ব্যাধি -মৃত্যুর পরম্পরা যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশ-কর্মের উপর আশ্রিত, তারই উপশান্তি। যেমন অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার অর্থ অগ্নির বিনাশ নহে, পরন্তু দাহ্যমান উপাদান সমূহের অভাবে অর্থাৎ ইন্দনাভাবে অগ্নির উপশান্তি। ভিক্ষু নাগসেন রাজা মিলিন্দকে বহু দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিরোধ বা নির্বাণ **'নাশ'** নহে, অপিতু কার্য-কারণ শৃঙ্খলার উপশান্তি বা বিলোপ। সুত্র নিপাতের **'উপসিব মানব পুচ্ছা'** হতে জানা যায়, অগ্নিশিখা যখন ইন্দনাভাবে অথবা বাত্যাহত হয়ে নির্বাপিত হয়ে যায়, তখন এ জানা যায় না যে, অগ্নি কোথায় গেল। সেইরূপ নাম -কায় (নামরূপ) বিমুক্ত পুরুষ ও যখন নির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর অস্তিত্ব জানা যায় না যে কোথায় গেল। সুতরাং নিরোধ বা নির্বাণ নিরন্বয় বিনাশের অর্থে তথাগত প্রয়োগ করেন নাই, অপিতু সংসার স্রোতের অবসান তথা এক অনির্বচনীয় পদ প্রাপ্তির সুচনা দিতেছে। যে রূপসত্তা আমরা সংসারে প্রচলিত মানতেছি, সেই রূপসত্তা নির্বাণে থাকে না। শাশ্বতঃ এবং উচ্ছেদ, সদ্ এবং অসদ্, এই উভয় অন্ত বিনির্মুক্ত এক অনির্বচনীয় পদই নির্বাণ, যাকে জানতে হলে

অন্তগ্রাহী দৃষ্টি ত্যাগ করে মধ্যেপদ অবলম্বন করতে হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরবাণী অনুধাবন যোগ্য– **'বুদ্ধ ভগবান স্বরূপ বোধের অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, যেখানে সদ্ এবং অসদ্ শব্দের প্রয়োগ করা যায়না, যেহেতু অস্তি এবং নাস্তি প্রকৃতির গুণ, স্বরূপ বোধ প্রকৃতির পরে।'**

একদা জনৈক ইউরোপীয়ান ডক্টর সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলেছিলেন।**'আপনি আমাকে নির্বাণ কি এক মুহূর্তে বুঝিয়ে দিতে পারেন কি?'** তিনি উত্তরে বলেছিলেন, **'পারব না কেন। যাতে অস্তি–নাস্তির মীমাংসা হয়, নির্বাণ সেইরূপ একটি নির্বিকল্প অবস্থা।'**

নির্বাণ সৃষ্টির অতীত, আদি হীন; একে জরা স্পর্শ করেনা, ক্ষয়হীন; এর উপর মৃত্যুর কোন প্রকার অধিকার নাই, নিত্য ধ্রুব; থেকে শ্রেষ্টতর কিছুই নাই সর্বোত্তম। সুতরাং নির্বাণ সৃষ্টি–স্থিতি– প্রলয়ের অতীত, ভাবাভাব বিনির্মুক্ত পরম আনন্দময় তত্ব।

নির্বাণে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ুর প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ নির্বাণ জড়বস্তু দ্বারা সৃষ্ট নয়। সেখানে গ্রহ–তারা আলোদান করেনা, সূর্য কিরণ সম্পাত করেনা, চন্দ্র প্রদীপ্ত হয় না অথচ অন্ধকারও সেখানে নাই। এরূপ নির্বাণকে যখন আপন অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ নিষ্কলুষ মূনি উপলব্ধি করেন, তখন তিনি রূপ, অরূপ, সুখ, দুঃখময় ত্রিভব বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেন। তাই বলা হয়েছে ঃ–

'যত্থ আপো চ পঠবী; তেজোবায়ো ন গাধতি,
ন তত্থ সুক্কাজোতন্তি, আদিচ্চো নপ্পকাসতি;
ন তত্থ চন্দিমাভাতি, তমোতত্থ ন বিজ্জতি।
যদা চ অত্তনা বেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো;
অথ রূপা অরূপাচ সুখ–দুক্খা পমুচ্চতি।'

বুদ্ধের দর্শনে রাজা প্রসেনজিত

– শীলানন্দ ব্রহ্মচারী।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য, জাত্যাভিমানী শাক্যবংশীয় রাজাগণও তাঁকে সমীহ করে চলতেন। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করে কাশীরাজ্য যৌতুক পেয়েছিলেন। বহুদিন উভয়ে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ক্ষমতা প্রতিপত্তির জন্য প্রসেনজিতের গর্বও ছিল অত্যধিক। তাঁর রাজধানীর উপকণ্ঠে জেতবনে বুদ্ধের আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা এবং তাঁর রাজ্যবাসীদের মধ্যে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের কাহিনী নানাভাবে তাঁর কানে এসেছিল। বিশেষভাবে বুদ্ধের বিরাট ব্যক্তিত্বের বর্ণনা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তখন জেতবন একটি বিরাট সঙ্ঘারাম। নানা দেশ থেকে ভিক্ষুরা আসতেন সেখানে বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য। অগণিত ভক্ত উপস্থিত হতেন পূণ্য সঞ্চয়ের আশায়। প্রত্যহ অপরাহ্নে বুদ্ধ সভা-ভবনে ভক্তদের দর্শন করতেন এবং ধর্মকথা শোনাতেন। একদিন অপরাহ্নে বুদ্ধের দর্শনপ্রার্থী জনতা জেতবনের সভাগৃহে সমবেত হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করেছিলেন। তখনও আস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যায়নি। জেতবনে তরুলতার আড়ালে পাখীর কলকূজন সুরু হয়েছে। সভাগৃহে নিস্তব্ধ জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে হঠাৎ কোশলরাজ প্রসেনজিতের আবির্ভাব হল। জনগণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। রাজা তাদের বসতে ইঙ্গিত করে একান্তে বসে পড়লেন। সভা আবার নিস্তব্ধতামগ্ন হল। বুদ্ধ যখন আপনার গন্ধকুটি থেকে বেরিয়ে সভাগৃহে আসছিলেন তখন তাঁর দিকে রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাঁর নবীন তরুণ মূর্তি দেখে রাজা যেন একটু হতাশ হলেন। জ্ঞান-গুণের খ্যাতির সঙ্গে বয়সের নবীনতা রাজার কাছে খাপছাড়া মনে হল। সম্যক সম্বুদ্ধ বলে যাঁর এত নাম, তাঁর বয়স যে এত কাঁচা হবে, তা রাজা ভাবতে পারেননি। তাই গর্বোদ্ধত রাজা তা'কে প্রণাম করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। কুশল জিজ্ঞাসার পরই তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন–ভবৎ গৌতম কি অনুত্তর বোধিজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন বলে স্বীকার করেন? বুদ্ধ উত্তর করলেন– হাঁ। রাজা বললেন– ভবৎ গৌতম, এই যে খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ জনগুরু গণাচার্য তীর্থঙ্কর সাধু পুনুষগণ আছেন যেমন পূরণ কাশ্যপ, মক্ষলি গোশাল, নির্গ্রন্থ নাথপুত্র, সঞ্জয়, প্রকুধ কাত্যায়ন, কেশকম্বলী অজিত, তাঁরাও আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুত্তর

বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেননি, আপনার কথাই বা কি? আপনি তো বয়সে ও দীক্ষায় তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। সভাস্থ জনতা নিস্তব্ধ হয়ে এর উত্তর শুনবার জন্য ব্যাকুল দৃষ্টিতে বুদ্ধের মুখের পানে তাকাল। বুদ্ধ বললেন – **মহারাজ, বিষধর সর্প, অগ্নি, রাজপুত্র ও সন্ন্যাসী এ চারজনকে ছোট বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, ঘাঁটানো সংগত নয়, কারণ বিষধর সর্প ক্ষুদ্র হলেও তার দংশনে মানুষের জীবনান্ত ঘটে, অগ্নিকে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করলে উপাদান সংযোগে তা প্রকান্ড হয়ে ক্ষতি সাধন করে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজপুত্রকে নাবালক বলে যে অবহেলা করবে সে তার কোপ দৃষ্টিতে পড়বে যখন সে রাজপুত্র রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে, তেমনি সন্ন্যাসীও নবীন তরুণ বলে উপেক্ষনীয় হতে পারে না, বয়স কিংবা দীক্ষার দিন তার মাপকাঠি নয়, অধ্যাত্মসিদ্ধিই তার মানদন্ড।** বুদ্ধের উত্তর শুনে রাজা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন – চমৎকার! চমৎকার! আপনার কথায় আমার ভুল ভেঙেছে, আমি আলো পেয়েছি, আমি আপনার শরণগত হলাম, আজ থেকে আমায় আপনার উপাসক বলে গ্রহণ করুন।

অতঃপর রাজা বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন– ভদন্ত, **লোকের অন্তরের কোন বৃত্তিগুলি অনর্থাবহ?**

বুদ্ধ উত্তরে বললেন – লোভ, দ্বেষ এবং মোহ – এ তিনটি মানুষের মনে উৎপন্ন হয়ে মানুষেরই ক্ষতি সাধন করে, অস্বস্তি বিধান করে এবং দুঃখাবহ হয়।

রাজা প্রসেনজিৎ– জগতে কোনো ব্যক্তির জরা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই আছে কি?

বুদ্ধ – না, মহারাজ, জরা মৃত্যুর হাত থেকে কারো রেহাই নেই; ধন, যশ, মান কিছুই জরা মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, এমন কি মুক্ত সিদ্ধপুরুষের শরীরও ভঙ্গুর পরিত্যজ্য।

রাজা – ভদন্ত, একদিন নিভৃতে আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল যারা কায়মনোবাক্যে পাপ কর্ম করে, তারা নিজেরা নিজেদেরি শত্রু এবং যারা সকল অবস্থায় সৎকর্মে রত, তারা নিজেরা নিজেদেরি বন্ধু।

বুদ্ধ – মহারাজ, তা ঠিক বটে, কাজেই যে নিজেকে ভালবাসে প্রিয় বলে জানে, তার দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ দুষ্কর্ম করলে দুঃখেরই উদ্ভব হয়। মানুষের পরলোক গমনের সময় শুধু তার কৃতকর্মই তার

অনুসরণ করে এবং তা নিজস্ব হয়। তাই পরলোকের কল্যাণের জন্য সর্বদা সৎকর্ম করা একান্ত উচিত। এ তার পরলোকে সত্যিকার সম্বল হয়।

রাজা – ভদন্ত, জগতে যারা বিপুল ধনসম্পদ লাভ করে ধনমত্ত হয় না, ইন্দ্রিয়পর হয় না এবং পরকে দুঃখ দেয় না, তাদের সংখ্যা খুব কম; অথচ যারা ঐশ্বর্য লাভে মদমত্ত ব্যভিচারী হয় এবং পরকে কষ্ট দেয়, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

বুদ্ধ – মহারাজ, আপনি ঠিক বলেছেন। নির্বোধ মৃগ যেমন আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্য পাশবদ্ধ হয়ে দুঃখ পায়, তেমনি নির্বোধ বিত্তশালী ব্যক্তিও আপনার ভোগপাশে বদ্ধ হয়ে আপনারই দুঃখ ডেকে আনে।

রাজা – ভদন্ত ,কাকে দান দেওয়া উচিত?

বুদ্ধ – যাঁর প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাঁকেই দান দেওয়া উচিত।

রাজা – কাকে দান করলে দানের বড় ফল পাওয়া যায়?

বুদ্ধ – সুশীল সজ্জনকে দান করলে দানের বড় ফল হয়। মহারাজ, আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, আপনি উত্তর দিন। আপনাকে বিরাট সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে যদি কোন অনভিজ্ঞ ভীরু দুর্বল ব্যক্তি বিশিষ্ট সামরিক পদের জন্য আপনার নিকট আবেদন করে, আপনি কি সে পদে তাকে নিযুক্ত করবেন?

রাজা – ভদন্ত, তাকে নিযুক্ত করতে পারি না, কারণ সে পদের যোগ্যতা তার নেই।

বুদ্ধ – যদি আপনার আসন্ন যুদ্ধে অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত নির্ভীক রণদক্ষ লোক সে পদের প্রার্থী হয়, তখন কি করবেন।

রাজা – তাকে তৎক্ষণাৎ সে পদে নিযুক্ত করব। কারণ সে পদের যোগ্যতা তার আছে এবং রণক্ষেত্রে এরকম লোকই চাই।

বুদ্ধ – মহারাজ, তেমনি যে গৃহত্যাগীর অন্তরে কামনা–বাসনার স্পর্শ নেই, বিদ্বেষ বিগত, সংশয় নির্মূলিত এবং শীল সমাধি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তিনিই দানের যোগ্য পাত্র। তাঁকে যে দান দেওয়া হয়, সে দানের ফল মহত্তর হয়।

রাজা– ভদন্ত, আমার মনে হয় আপনি ধর্ম প্রচার করেছেন সৎসঙ্গরত সজ্জনের জন্যই, কুসঙ্গরত দুর্জনের জন্য নয়।

বুদ্ধ – মহারাজ, আপনার ধারণা ঠিক। শাক্যরাজ্যের নগরক নামক স্থানে আমি যখন থাকতাম, ভিক্ষু আনন্দ আমায় বলেছিল– সৎসঙ্গ ও

সচ্চিন্তা ব্রহ্মচর্যের অর্ধেক। আমি তখনি তাকে বলেছিলাম–শুধু অর্ধেক নয়, সমস্ত ব্রহ্মচর্যই সৎসঙ্গ ও সচ্চিন্তা। সৎসঙ্গ লাভ করে সাধনার পথে অগ্রসর হতে হয়, এ তার প্রমাণ। সম্বুদ্ধের সঙ্গলাভ অনেকের জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের হেতু হয়। সৎসঙ্গ যে সমস্ত ব্রহ্মচর্য, এতেই বোঝা যায়। সুতরাং সৎসঙ্গের জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। সৎসঙ্গে মানুষের অপ্রমত্ততা আসে চৈতন্যোদয় হয়। তা ইহলোকে ও পরলোক সর্বত্র কল্যাণকর।

একদিন মধ্যাহ্নে রাজা প্রসেনজিৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন– মহারাজ, এ দুপুরের রোদে, এ ভাবে আপনি কোত্থেকে আসছেন?

রাজা উত্তরে বললেন – ভদন্ত, এ শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী পরলোক গমন করেছেন; তিনি সন্তানহীন, তাঁর অপুত্রক সম্পদ রাজকোষাগারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে এখানে আসছি; তাঁর ভান্ডারে আশী লক্ষ স্বর্ণমূদ্রা সঞ্চিত ছিল, রৌপ্য ইত্যাদির কথাই বা কি? অথচ এ বিশাল সম্পদ তাঁর কোন কাজে লাগে নি। কদর্যআহার রুক্ষ বেশভূষা তাঁর ধনীত্বকে ব্যঙ্গ করে সীমাহীন কার্পণ্য প্রকাশ করত।

ভগবান বললেন– মহারাজ! নির্বোধ অসাধু লোক বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও নিজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারে না, স্ত্রীপুত্রকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করে না, মাতাপিতার সেবা করে না, দানে মুক্তহস্ত হয় না, তার ধনসম্পদের এই পরিণতিই হয়; কিন্তু সজ্জন ধনসম্পদ লাভ করে নিজে সুখী হয়; স্ত্রী পুত্রকে সুখী করে, মাতাপিতার সেবা করে, বন্ধুবান্ধবের উপকার করে এবং বিবিধ সৎকর্ম সম্পাদন করে, এভাবে তার অর্থলাভ সার্থক হয়।

রাজা প্রসেনজিৎ প্রায়ই বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য জেতবনে আসতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁকে বললেন – মহারাজ, জগতে চার রকমের লোক দেখা যায়। যথা– তমোতমপরায়ণ, তমোজ্যোতিপরায়ণ, জ্যোতিতমপরায়ণ এবং জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ, দারিদ্র্যক্লিষ্টর দুঃখপীড়িত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রোগ–শোক জর্জরিত হয়েও যে ব্যক্তি পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, সে ব্যক্তিকে তমোতমপরায়ণ বলে জানবেন– অন্ধকার হতে অন্ধকারের দিকেই সে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে থেকে আপনার আবিল কর্মের ভিতর দিয়ে সে পরলোককেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে

তোলে; এরকম অন্ধকার আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে সর্বদা সৎকর্মে রত হয়, সে তমোজ্যোতিপরায়ণ অর্থাৎ অন্ধকার হতে সে আলোর দিকে যাত্রা করে; তার সুচরিত কর্ম তার পরলোককে উজ্জ্বল করে; যে ব্যক্তি জ্যোতিতমপরায়ণ অর্থাৎ আলো থেকে সে অন্ধকারের দিকে ছোটে; সুখ– সৌভাগ্যময় জীবন পেয়ে যে সৎ ও ধার্মিক হয়, সে জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ অর্থাৎ আলো থেকে আলোর দিকে গমন করে– তার উভলোক উজ্জ্বল।

একদিন ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলেন– রাজা প্রসেনজিতের হুকুমে বহু লোককে বন্দী করে নেয়া হচ্ছে, কেউ রজ্জুতে, কেউ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ দৃশ্য দেখে তাঁদের অন্তর কেঁপে উঠল। অপরাহ্নের বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলল। বুদ্ধ তাঁদের আলোচ্য বিষয় জেনে বললেন– ভিক্ষুগণ, এ বন্ধন তো দৃঢ় বন্ধন নয়, লৌহময় কাষ্ঠময় রজ্জুময় বন্ধন অতি তুচ্ছ বন্ধন, ধনসম্পদের প্রতি পুত্রকন্যার প্রতি অন্তরের আসক্তিই দৃঢ়তম বন্ধন– এ বন্ধন যদিও মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে না, তবুও তার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করে রাখে, এ বন্ধন দুর্মোচ্য; ঋষিগণ এ বন্ধনকেই ছিন্ন করে মুক্তির উদার আনন্দে মগ্ন হন।

এহিপস্‌সিকো–এসো দেখো

যেমন কর্ম তেমন ফল–ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই আসুন, কোন শীল লঙ্ঘনে ও কোন শীল পালনে কিরূপ ফল হয় তা পদ্যে সংক্ষেপে জেনে নিই –

১। প্রাণী হত্যা পরজন্মে প্রাণী হত্যা করি জীবগণ, ইহ জন্মে ধন–ধান্য বিবিধ রতন। কন্দর্প সমান রূপ পেয়েও যৌবনে, অকাল মরণ লভে প্রাণীর হননে।	দীর্ঘ আয়ু হয় লাভ এ শীল পালনে
২। চুরি পরজন্মে পরবিত্ত করিয়া হরণ, অনাথ হইয়া করে ভিক্ষা আচরণ। ঝুলি হাতে দেখি তারে হেয় জ্ঞান করে জীর্ণবস্ত্র পরি সদা শত্রু ঘরে ফিরে।	ধনাঢ্য কুলে হয় জন্ম এ শীল পালনে।
৩। ব্যভিচার জন্মে জন্মে ব্যভিচার করি আচরণ, নর–নারী স্ত্রীত্ব লভে মুক্ত নাহি হন। নর লভে নারী জন্মে; নারী হয় নারী , মহা দুঃখ ভোগে তারা দিবস– শর্ব্বরী।	পুরুষত্ব হয় লাভ এ শীল পালনে
৪। মিথ্যা কথা জন্মে জন্মে মিথ্যাবাক্য ভাষি হীনজন, মুখেতে দুর্গন্ধ বহে অপ্রিয় দর্শন জড় মুক হীনবুদ্ধি বহু জন্ম হয়, অনন্ত দুঃখের ভাগী হইবে নিশ্চয়।	আজীবন শুভ্র সুশ্রী দন্তরাজি হয় লাভ এ শীল পালনে।
৫। সুরা পান হলাহল বিষসম সুরা পান করি, উন্মাদ অনাথ হয় লজ্জা পরিহরি; জ্ঞাতি মরণাদি তার দুঃখ উপজয়, শোক–তাপ সহে কত বিশ্রী দেহ হয়।	মেধা ও পরিপূর্ণ দেহ হয় লাভ এ শীল পালনে।

সুভাষিত সংগ্রহ

★ পরনির্ভরশীলতা পাপ বিশেষ –বুদ্ধ

★ উপলব্ধি ছাড়া এ ধর্মের কোন মূল্য নেই –বুদ্ধ

★ শিক্ষা মানুষের জীবনে পূর্ণতা এনে দেয় – বুদ্ধ

★ সংসার একান্তই অপূর্ণ ও অতৃপ্ত – বুদ্ধ

★ অলসতা একটি সর্বনাশা ব্যাধি – বুদ্ধ

★ পূণ্যকর্ম ত্বরান্বিত করা উচিত কারণ এজীবন যে কোন মূহুর্তে অবসান হতে পারে –বুদ্ধ

★ বুদ্ধ মুক্তিদাতা নহেন, মার্গদাতা –বুদ্ধ

★ যাঁর একটি সুন্দর হৃদয় রয়েছে তিনি সবকিছুতে সৌন্দর্য খুজে পান - জনৈক পাশ্চাত্য মণিষী

★ ভগবান বুদ্ধ বলেছেন - আটটি কারণে স্ত্রীরা স্বামীকে অবজ্ঞা করে– (১) দরিদ্র হলে, (২) আতুর হলে,(৩) বার্দ্ধক্য হলে, (৪) সুরাসক্ত হলে, (৫) মূর্খ হলে (৬) অমনোযোগী হলে, (৭) সর্বকার্যে স্ত্রীর অনুবর্ত্তন হলে, (৮) নিজে না রেখে স্ত্রীর হাতে সর্বস্ব সমর্পন করলে।

★ চারিটি বস্তু পরকুলে রাখা অকর্তব্য – **বলীবর্দ্দ, গাভী, যান ও স্ত্রী**। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এচারিটি বস্তু নিজের গৃহে সুরক্ষিত রাখবেন।

বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা নিজ, তব,
রাখিও না জ্ঞাতি গৃহে কখনও এ'সব।
যান নষ্ট হয় পড়ে আনাড়ীর হাতে,
বলীবর্দ্দ প্রাণে মরে অতি খাটুনিতে।
দুধ দূয়ে বাছুরে জীবনান্ত করে,
রমণী প্রদুষ্টা হয় থাকি জ্ঞাতি ঘরে।

★ নেতৃত্বের মানদন্ড -

১। উচ্চশিক্ষিত
২। যে বিষয়ে নেতৃত্ব সে বিষয়ে বিশ্বস্ত
৩। সৃজনশীল,
৪। দায়িত্বশীল
৫। সহানুভূতিশীল

সূত্র ঃ BTV সম্প্রচার ঃ ২৯ মার্চ শনিবার, সকাল ৬.৩০ মি : ২০০৯ খ্রী :

★ পোষাক দিয়ে কি হবে, সেতো বাহ্যিক আবরণ মাত্র। ভেতরের জ্ঞানটুকুই তো আসল সৌন্দর্য্য- সক্রেটিস।

★ অহংকার সকল বিকারের মূল- উপাসিকা আর. তুলী।

★ জগতে ধর্ম সকল সময় বিদ্যমান যা একবুদ্ধের শাসনকাল পর্যন্ত পালিত হয়। কালের গহবরে লুক্কায়িত এ শাশ্বতঃ ধর্মকে বুদ্ধগণ জগতে আবির্ভূত হয়ে দুঃখমুক্তির জন্য জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। - বুদ্ধ।

★ জন্মসূত্রে কেউ উচ্চ বংশজাত, নীচ বংশজাত হয় না; কর্মের দ্বারাই হয়। – বুদ্ধ

★ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গীয় সুখ এবং ত্রি-ভূবনের আধিপত্যের চেয়ে ধর্মশ্রোতে অবগাহন শ্রেষ্ঠ; –ধম্মপদ

★ বড় কোন উপঘাতক কর্মের ফলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হলে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কৃত কর্ম ফলপ্রসূ হয়ে থাকে – কর্মতত্ত্ব।

★ 'বৌদ্ধ ধর্ম একটি মহাজাগতিক ধর্ম, বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম'– বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। ায়ী, নিজের দুঃখের জন্য নিজেই দায়ী' –বুদ্ধ

★ 'হে আনন্দ আত্মনির্ভরশীল হও,

★ 'নিজের সুখের জন্য নিজেই দ অন্যের ওপর ভরসা করো না' – বুদ্ধ।

★ যে কোন ধরণের অন্যায় পাপ বিশেষ–বনভন্তে।

★ দুঃখ যদি সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক হয় তাহলে সেই দুঃখ উপশমকারী অষুধরূপ ধর্মও সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক হবে না কেন?'– এস. এন. গোয়েঙ্কা।

★ 'এক প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে আরেক প্রাণী কখনো সুখী হতে পারে না'। – বুদ্ধ।

★ 'কর্মের ফল বড়ই বিচিত্র, ইহার কোনো কালাকাল নাই।, – বুদ্ধ।

★ প্রতিমূহুর্তে পরিবর্তনশীল সর্বশেষ চিত্তই পরবর্তী জন্মের নিয়ামক। এ অন্তিম চিত্তের অবস্থার ওপরই পরবর্তীজন্মের অবস্থা নির্ভরশীল – বৌদ্ধ দর্শন।

★ একমাত্র আকাশ এবং নির্বাণই চিরস্থায়ী। – বুদ্ধ।

★ 'সংসার ত্যাগ কা অর্থ হ্যায় ধন কে পীছে ন্হী ভাগেঁ। লোভ ন্হীঁ করেঁ। জিতনা হ্যায় উসমে রহকর ধন কা সদুপযোগ করেঁ। পদ, মান, প্রতিষ্ঠা কে পীছে ভাগেংগে তো মন মেঁ তৃষ্ণা পয়দা হোগী ঔর যদি তৃষ্ণা পূরী ন্হীঁ হুঈ তো দুঃখ হোগা' – উপাসিকা আর. তুলী।

সাধু!! সাধু!! সাধু!!

ভবতু সব্ব মঙ্গলং

বিদর্শন–ভাবনাকে কোন্ কোন্ পথের সাথে তুলনা করা যায়?

বিদর্শন–ভাবনা–

১। অমানুষকে মানুষ করার পথ।
২। পশুত্ব হতে মনুষ্যত্বে বিকাশিত হওয়ার পথ।
৩। কঠিন ব্যাধি নিরাময় করার পথ।
৪। শারীরিক ও মানসিক অশান্তি দূর করে, অনুপম শান্তি লাভের পথ।
৫। শীল পরিশুদ্ধির পথ।
৬। সংস্কার ধ্বংস করার পথ।
৭। দশ–সংযোজন ছিন্ন করার পথ।
৮। দশ-ক্লেশ নির্মূল করার পথ।
৯। জন্ম ক্ষয় করার পথ।
১০। অপায় – দ্বার বন্ধ করার পথ।
১১। ত্রি–লক্ষণ জ্ঞান হওয়ার পথ।
১২। পঞ্চ–মার পরাজয় করার পথ।
১৩। পঞ্চ–নীবরন উচ্ছিন্ন করার পথ।
১৪। চারি পরিশুদ্ধ–শীল পালন করার পথ।
১৫। সপ্ত–বিশুদ্ধি শুদ্ধি লাভের পথ।
১৬। আর্য–অষ্টাঙ্গিক–মার্গ অনুশীলনের পথ।
১৭। দশ–উপক্লেশ সাক্ষাৎ করার পথ।
১৮। ষোল–বিদর্শন– স্তর পরিক্রমার পথ।
১৯। বিমোক্ষ–মুখে প্রবেশ করার পথ।
২০। সর্বপ্রথম নির্বাণ দর্শনের পথ।
২১। নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করার পথ।
২২। পরা–শান্তি লাভ করার পথ।
২৩। করণীয় সমাপ্ত করার পথ।
২৪। কাল–জয়ী হওয়ার পথ।
২৫। প্রজ্ঞা–বিমুক্তি লাভের পথ।
২৬। সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণের পথ।

অমৃতপদ (নির্বাণ) না দেখে যে একশ' বছর জীবিত থাকে তার জীবনের অপেক্ষা অমৃতপদ যিনি দেখেছেন তেমন লোকের একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ– 'ধম্মপদ'।

আনতর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়া - এর সৌজন্য।

<u>বি :দ্র :</u> উপযুক্ত গুরুর অধীনে বিদর্শন ভাবনা বিধেয়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

- মহাশান্তি মহাপ্রেম – by- শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
- মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন – by- ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী
- ভগ্ওয়ান বুদ্ধ্ কা ধর্ম্ – by- ভদন্ত্ আনন্দ্ কৌসল্ল্যায়ন,পুস্তিকা
- মনুষত্ব বিকাশে ধর্ম – by - বঙ্গানুবাদ ডঃ সুকোমল চৌধুরী
- মহাপুরুষ লক্ষণ – by- বোধিমিত্র ভিক্ষু
- ধম্মপদ (ত্রিপিটকান্তর্গত)– প্রকাশক আবদুল আজীজ আল আমান এম.এ.
- বৌদ্ধ দর্শন– by- রাহুল সাংকৃত্যায়ন, অনূদিত পুসতক
- Buddhism In the Eyes of Intellectuals –by- K. Sri Dhammananda পুস্তিকা, তাইওয়ানে মুদ্রিত।
- শিব ও বুদ্ধ- by- ভগিনী নিবেদিতা, অনূদিত পুস্তিকা; প্রকাশক –স্বামী নির্জরানন্দ
- শাক্যমুণি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব– by- অঘোর নাথ গুপ্ত, পুস্তক।
- সদ্ধর্ম রত্নাকর - গ্রন্থ, অনুবাদ- by- শ্রীমৎ -ধর্মতিলক স্থবির, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত।
- বিদর্শন-পূর্ণ শান্তি ও সমাধান সূত্র – পুস্তিকা, by- বোধিপাল শ্রামণের।
- Ethics (আচার-পদ্ধতি) - পুস্তিকা, by- উপাসিকা আর. তুলী।

প্রকাশিতব্য ঃ- প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, (The Infallible Rule of Nature)।